'উই আর সেভেন্'

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

'রসচক্রে'র প্রাণস্বরূপ,

আমার কনিষ্ঠ সহোদর তুল্য,

পরম স্নেহভাজন—

শ্রীযুক্ত রাধেশ রায়কে

এই বইখানি দিলাম।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মহালয়া

১৩৪৭।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সর্ব্বজন-সমাদৃত গ্রন্থাবলী

জমা-খরচ	১॥০
মুক্তাঝারি	১।০
ধাঁধাঁর উত্তর	১।০
'৭০৩'	১॥০
স্ত্রী	১।০
প্রিয়তমাসু	২।০
চৌ-চৌ	২৲
যৎকিঞ্চিৎ [ছবিতে ভরা]	১॥৵০
জগদীশের দিকদারী [নাটক— মনার্ভায় অভিনীত]	॥০
মাটির স্বর্গ	২৲
সকলি গরল ভেল [চিত্রে চিত্রময়]	১॥০
বেড্ নম্বর ৩২	২৲
রসের নাড়ু [বালক-বালিকাদের জন্য]	।৴০
বরদা ডাক্তার	১৲
পথের স্মৃতি	২।০
নীতি ও কাহিনী	৵১০
'উঠ আর সেলেন'	২৲
তিনকাট নাম্বার	২৲

প্রকাশক :—

দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'টুই আর সেভেন্'

আমরা সাত জন। সাত ভাই বোন নয়, সাত জন মাষ্টার,—স্কুল-মাষ্টার। আমি, জিতেন, পশুপতি, কেদার, যতীন, কেষ্টবাবু, আর বুড়োদাদা। বুড়োদাদার নাম স্কুলের খাতায় ছিল—দয়ালকৃষ্ণ দাস; কিন্তু আমাদের কাছে এবং আমাদের কাছ হইতে সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁহার 'রেজিষ্টার্ড নাম' হইয়া গিয়াছিল—বুড়োদাদা। আর তাঁহার 'ট্রেড্‌মার্ক' ছিল—দেহটি কৃশ; হাড়গুলি মোটা-মোটা; দাঁতগুলির যে কয়টি এখনও পড়ে নাই, তাহাতে সযত্নে সঞ্চিত ময়লার দাগ; মাথার বিরল কেশগুলি সবই পাকিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; অবসর প্রাপ্ত গাল দুইটির মধ্যবর্ত্তী নাসিকাটি একটু বেশী রকম সজাগ থাকিয়া সমস্ত মুখখানাকে যেন মাথা-খাড়া করিয়া পাহারা দিতেছে। বুড়োদাদা নিজে তাঁহার বয়স বলিয়া থাকেন—বাহান্ন, কিন্তু জলটুকু বাদ দিয়া খাঁটি হিসাবে, আমাদের মনে হয় যে, আমাদের ছয়জনের বয়সের সমষ্টি যাহা, বুড়োদাদার বয়স ঠিক তাহার সমান না হইলেও, কাছাকাছি হইবে। এই কারণেই ইনি আমাদের বুড়োদাদা। বুড়োদাদা কথায় কথায় একটি কথা প্রায়ই আমাদের শুনাইয়া দেন, এক সময়ে তাঁহারও নাকি যৌবন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বিচার করিয়া এরূপ অতীতে আমরা কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

রামচন্দ্রপুর একটা ছোটখাট পাড়া-গাঁ। ইহার জমিদারও ছোট। কিন্তু এখানকার স্কুলটা বাঙ্গলা স্কুল হইলেও, এ অঞ্চলের মধ্যে বড়। তাই মাষ্টারের সংখ্যা ইহাতে—সাত,—অর্থাৎ আমরা সাত জন।

'উই আর সেভেন্'

কাজের মধ্যে, বুড়োদাদা নীচের ক্লাসে মানসাঙ্ক করাইতেন, ড্রইং করাইতেন, 'কথামালা' পড়াইতেন আর বেশীর ভাগ সময়, বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেন।

সে দিন স্কুলে ইনস্পেক্টর আসিয়া হাজির। সংবাদ পাইয়াই বুড়োদাদা খুব হাঁকিয়া হাঁকিয়া 'কথামালা' পড়াইতে সুরু করিলেন—"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিছুতেই—।" ইনস্পেক্টর তাঁহার ক্লাসে আসিয়া কহিলেন, "কি পড়াচ্চেন ?"

"আজ্ঞে, কোথামালা।"

"আপনার দেশ বোধ হয় কাঁথির ঐ দিকে ? ওটা কোথামালা নয়, কথামালা। আচ্ছা কথামালা কথাটার মানেটা এদের বুঝিয়ে দিন দেখি।"

ছেলেদের দিকে চাহিয়া বুড়োদাদা কহিলেন, "দেখ, তোমরা সব শিশু, অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে। তোমরা এই রামচন্দ্রপুর জয়চন্দ্র ইনটিটিউশনে—"

ইন্সপেক্টর একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও-সবের দরকার নেই, শুধু 'কথামালা' কথাটার মানে এদের বুঝিয়ে দিন।"

"যে আজ্ঞে। শুন সকলে, বুঝ ; এই কথামালা মানে তোমরা জান কি ? আমি বহুবার তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি, পুনরায় অদ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত ইন্সপেক—"

এবার বিরক্তিটা সুপ্রকাশ করিয়া ইন্সপেক্টর কহিলেন, "ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু মানেটা বুঝিয়ে দিন।"

"আজ্ঞে তাই দিচ্ছি। এই কোথামা—কথামালা মানে হচ্চে, অর্থাৎ— এই কতগুলি অক্ষর একসোঙ্গে থাকলে এক একটি কোথা হয় !"

"আবার 'কোথা' ?"

"একটি কথা হয়। সেই কথাগুলিকে কালি দিয়া ছাপাইয়া, কাগজে গাঁথিয়া মালা তৈরী করা হোয়েছে। অনেকগুলি অক্ষর নিয়ে একটি কথা এবং সেইরূপ অনেকগুলি কথা লইয়া একটি মালা। বুঝতে পেরেচ সব ?"

ইন্সপেক্টর কহিলেন, "ওরা হয়ত পেরেচে, কিন্তু আমি পারলুম না। আচ্ছা কিসের গল্প পড়াচ্ছেন ? বাঘ ও বক ? এটা গদ্য করুন দেখি।"

"হুজুর, এইটাইত গদ্য।"

"তবে, পদ্য করুন। বুঝেছেন ? বাঘ ও বকের গল্পটা পদ্য করে ফেলুন। শীগ্‌গির। আধ ঘণ্টার মধ্যে। লিখে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।"

ইন্সপেক্টর অন্য ক্লাসে গেলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, বুড়োদাদা যতীনের শরণাপন্ন হইলেন। আমাদের ভিতর হেডমাষ্টার কেষ্টবাবু আর যতীন একটু আধটু কবিতা লিখিতে পারিত। বুড়োদাদা যতীনকে কহিলেন, "দে ভাই, শীগ্‌গির এর একটা কবিতা লিখে দে ; দিয়ে আমাকে বাঁচা। কি অদ্ভুত ফরমাজ দেখো না একবার। পদ্যকেই ত গদ্য করে, এ যেন উল্টো রাজার দেশের উল্টো খেয়াল !" যতীন কহিল, "আপনিও উল্টো ক'রে দিন।" বুড়োদাদা কথাটায় কান না দিয়া, যতীনকে তাড়া দিয়া কহিলেন, "যা লেখবার লিখে দে ভাই শীগ্‌গির। আধঘণ্টা সময় দিয়েছে।"

যতীন তাড়াতাড়ি করিয়া কবিতাটা লিখিয়া ফেলিল। বুড়োদাদা তাহা ভাঁজ করিয়া পকেট-জাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্সপেক্টার আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হোয়েছে কবিতাটা ?"

আমরা সাত জনই তখন আফিসঘরে উপস্থিত। 'টিফিন' হইয়াছে।

বুড়োদাদা কহিলেন, "হুজুরের হুকুম, না হোয়ে যায় ?" বলিয়া বুড়োদাদা পকেট হইতে ভাঁজকরা কাগজখানা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে

দিলেন। তিনি মনে মনে পড়িয়া বলিলেন, "এ কি! এ যে কুসুমের টাকার হিসেব। কুসুমটা কে? চুড়ি ১ গাছ, আংটী ১টা, শাঁখা ৩ গাছা, মোট ২৩৲ টাকায় বাঁধা, সুদ ৩৭৷৷০ টাকা, মোট—"

"হুজুর, ওটা দিন, ওটা নয়।" বলিয়া বুড়োদাদা আবার পকেটের মধ্যে হাত দিলেন। ইন্সপেক্টার কহিলেন, "ধার করেচেন বুঝি? তা ২৩৲ টাকার ৩৭৷৷০ সুদ! এ কুসুমটি কোন্ কাননের কুসুম?"

বুড়োদাদা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "দুঃখের 'কোথা' আপনার কাছে কি বলবো হুজুর! চোদ্দটা টাকায় কিছুতেই আর চালাতে পারি না বাবু! আপনার দয়ায় যদি কিছু ইনক্রিমেণ্ট—"

"আচ্ছা সে হবে, কিন্তু কই, পদ্যটা কই?"

"এই যে হুজুর।"

ইন্সপেক্টার সমস্ত কবিতাটা মনে মনে পড়িয়া কহিলেন, "সুন্দর হোয়েছে, খাসা হোয়েছে। আপনি বর্ত্তমানে কত করে পাচ্চেন?"

"চোদ্দটি টাকা হুজুর।"

"আসচে মাস থেকে যাতে আপনি বার টাকা করে পান, সে সম্বন্ধে 'রেকমেণ্ড্' ক'রে আজ লিখে যাব। মাষ্টার মশায়রা, কবিতাটা একবার আপনারাও পড়ুন।" বলিয়া ইন্সপেক্টার কাগজখানা কেষ্টবাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, "একবার হেঁকে পড়ুন ত।"

কেষ্টবাবু হাঁকিয়া পড়িলেন—

একদা একটি হাড়ের গলায়
ফুটেছিল এক বাঘ।
ব্যথায় যতই হোল সে কাতর
হ'ল তত তা'র রাগ।

হাড় বিস্তর করিল চেষ্টা

তবু পারিল না হায়

বাহির করিতে বাঘটিকে সে যে—

যাতনায় প্রাণ যায়।

অবশেষে এক শিয়ালের কাছে

ছুটিয়া গিয়া সে কয়—

"দয়া করে দাও বাঘ বার করে

হে শৃগাল মহাশয়।"

শৃগাল কহিল—"ভয়টা কি তা'র,

সরে এস মোর কাছে ;

দেখি একবার—দুষ্টু ব্যাঘ্র

কোথায় ফুটিয়া আছে।"

এই না বলিয়া ধূর্ত্ত শিয়াল

হাড়খানি লয়ে মুখে,

কড়্-মড়্-কড়্ লাগিল চিবাতে

শু'য়ে শু'য়ে মহাসুখে।

ইন্সপেক্টার কহিলেন, "অতি সুন্দর! তা উল্‌টো কথামালা যেমন লিখেছেন, দুটাকা উল্‌টো 'ইনক্রিমেণ্ট'-ও হোয়ে যাবে আপনার।"

বুড়োদাদা তাঁহার উচ্চ নাকটিকে উচ্চতর করিয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইন্সপেক্টার চলিয়া গেলেন।

বুড়োদাদা যতীনের দিকে চাহিয়া সখেদে কহিলেন, "কি কাণ্ডটাই করলে বল ত যতীন?"

যতীন কহিল, "কাণ্ডটা আর কি? যেমন উল্টো ফরমাস, তেমনি উল্টো কথামালা হবে না ত কি?"

তেমনি সখেদে বুড়োদাদা কহিলেন, "এদিকেও তেমনি উল্টো 'ইন্‌ক্লিমেণ্টের' যে ব্যবস্থা হোয়ে গেল!"

তখন সকলে মিলে আমরা বুড়োদাদাকে ভরসা দিলাম—"কোন ভয় নেই। ইন্সপেক্টার ভারি রসিক লোক। দেখবেন, আপনার দু'টাকা মাইনে ঠিক বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, 'ইন্‌ক্লিমেণ্ট' নয়, 'ইন্‌ক্রিমেণ্টই' হোয়ে যাবে।"

হইলও তাই। আমাদের ইন্সপেক্টার ছিলেন একদিকে যেমন খুব রসিক, অপর দিকে তেমনি দয়ালু। সত্যই তিনি বুড়োদাদার প্রতি সদয় হইয়া পরের মাস হইতে তাঁহার ষোল টাকা হিসাবে বেতনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যেদিন বুড়োদাদা ষোলটাকা মাহিনা পাইলেন, সেদিন তাঁহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে! পশুপতি কহিল, "এইবার মাথাটা নীচের দিকে ক'রে একবার উল্টো নাচন নেচে ফেলুন বুড়োদাদা।"

এমনই সুখে, এমনই আনন্দে—কাটাইতেছিলাম আমরা সাতজন! কিন্তু 'ভেকেসনে'র পর কি কুক্ষণে যে সেই লোকটা—সেই হ্যাট্-কোট্-পরা লোকটা—'লটারী'র টিকিট বিক্রয় করিতে আমাদের রামচন্দ্রপুরে পদার্পণ করিয়াছিল!

কথাটা তবে খুলিয়াই বলি।

'হাওড়া চ্যারিটী লটারী'র টিকিট বিক্রয় করিতে একটি বাঙ্গালী-সাহেব আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। সে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বুড়োদাদাকে এক টাকা দিয়া একখানা টিকিট বিক্রয় করিয়া যায়। সেই টিকিটই বুড়োদাদার সর্ব্বনাশ ঘটাইল। শুধু বুড়োদাদারই বলি কেন, আমাদেরও সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

'উই আর সেভেন্'

লটারীর প্রথম পুরস্কার ছিল ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার ৩০ হাজার—এইরূপ। সর্ব্বশেষ পুরস্কারটিও যদি ওঠে, তাহা হইলেও ৫ হাজার টাকা। কিন্তু বুড়োদাদা আমাদের, সর্ব্বশেষও নয়, দ্বিতীয় তৃতীয়ও নয়, প্রথম পুরস্কারটিরই আশা করিয়া টিকিটখানি কিনিয়াছিলেন। 'শুভনাম' অর্থাৎ 'হ্যম-ডি-প্লুম্' দিয়াছিলেন—"ভোলাবাবা"। আমাদের এখানে হাড়োয়া-হাটের কাছে ভোলাবাবা নামে এক সাধুর আস্তানা। বুড়োদাদা তাঁর খুব ভক্ত। একটু কিছু হইলেই বুড়োদাদা তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইয়া থাকেন। টিকিটখানা কিনিবার পরও সুতরাং বুড়োদাদা একদিন তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি কহিলেন, "আমার নাম যখন দিয়েছিস, তখন প্রাইজের টাকা তোর বাক্সে এসে গেছে জানবি। তবে প্রথম পুরস্কারটা অন্য লোকে পাবে, তোর দ্বিতীয় পুরস্কার। যা বেটা, ঘরে যা।" পরদিন পাড়ার নন্দ ঘোষের নিকট হইতে, কানের একজোড়া সোনার দুল বাঁধা রাখিয়া বুড়োদাদা পাঁচটা টাকা লইল এবং তদ্দ্বারা মস্ত এক সিধা সাজাইয়া, তৎসহ সস্ত্রীক ভোলাবাবার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। ভোলাবাবা সেই ২৮৮০০ নম্বরের টিকিটখানা হাতে লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া দিলেন। সেইদিন রাত্রিতে বুড়ো-বৌদি স্বপ্ন দেখিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট-ভরা রেজস্ট্রী করা খাম হাতে পিওন আসিয়া তাঁহাদের ডাকাডাকি করিতেছে।

তিন দিন আর বুড়োদাদা স্কুলে আসিলেন না। চতুর্থ দিনে যদিও আসিলেন, কিন্তু বড় একটা আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন না। তবে বুঝা গেল, তাঁহার অন্তরে আনন্দ ও উৎসাহের একটা ফল্গুধারা বহিয়া যাইতেছে।

কেষ্টবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ড্রইং হবে বুড়ো—দা?"

"৭ই ভাদ্র।"

পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাটা রাখবেন কোথায়? এক আধ টাকা ত নয়—৫০ হাজার! কোলকাতার কোন বড় ব্যাঙ্কে রাখা উচিৎ।" যতীন কহিল, "কি উচিৎ, কি অনুচিৎ, সে আর বুড়োদাদাকে তোমার শেখাতে হ'বে না।" কেদার কহিল, "শেখানো নয়; আমাদের এই সাত জনের ভেতর একটা পরামর্শ আর কি।" বুড়োদাদা কিন্তু কোন কথা না বলিয়া নীরবেই রহিলেন।

ইতোমধ্যে চারিদিক্ হইতে খবর পাওয়া গেল, বুড়োদাদা হরিশ স্যাক্‌রাকে সোনার বাজার-দর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ১০০ ভরি সোনাতে কি কি ভাল ভাল গহনা হইতে পারে, তাহার হিসাব লইয়াছেন; একটা চক-মিলানো দোতালা বাড়ী করিতে গেলে কত লক্ষ ইটের দরকার, কোলকাতায় একটা ছোট-খাট বাড়ী করিতে কত ব্যয় হয়, একখানা মটর গাড়ীর দাম কত, প্রভৃতি সংবাদও সংগ্রহ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাস কাটিয়া গেল। প্রবল বর্ষার ধারায় রামচন্দ্রপুরের মাঠ, ঘাট, বিল, প্রান্তর ভাসিয়া একাকার হইয়া গেল। কিন্তু বুড়োদাদার অন্তর-ক্ষেত্রে বর্ষার একবিন্দু বারিও প্রবেশ করিতে পারিল না, তথায় তখন সহস্র-পুষ্প-বাসিত বসন্তের মধুর বাতাস প্রবাহিত।

১৫ই ভাদ্র সংবাদ পত্রে বাহির হইল, হাওড়া চ্যারিটি-লটারীর প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে—মুর্শিদাবাদের মহম্মদ কেরায়েতুল্লা খাঁ।

দ্বিতীয় পুরস্কার? কোন খবর লেখা নাই। বুড়োদাদা ছটফট্ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই স্কুল করিয়া তিনি ভোলাবাবার কাছে যাতায়াত সুরু করিয়া দিলেন। ভোলাবাবা বুড়োদাদাকে বলেন, "দ্বিতীয় পুরস্কার—তোমার। যা বোলে দিয়েছি, তার আর নড়্-চড়্ হবে না।"

কেষ্টবাবু কহিলেন, "দাদু, হয় ত টাকাটা ফাঁকি দিয়ে গাফ্ করবার মৎলবে আছে, একখানা চিঠি দিন।" জিতেন কহিল, "টিকিটের নম্বর দেবেন না যেন ; খালি লিখবেন যে কত নম্বরের টিকিট দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে, তা জানাবেন।"

আমি কহিলাম, "চিঠিখানা রেজেষ্টি ক'রে দেবেন।"

পশুপতি কহিল, "শুধু রেজেস্ট্রী নয়, উইথ য়্যাক্‌নলেজ্‌মেণ্ট ডিউ।"

কিন্তু আমরা জানিতাম না যে, তৎপূর্ব্বেই চিঠি দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহা ভোলাবাবার দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; আর চিঠিখানা পাঠাইবার পর হইতেই বুড়োদাদা প্রত্যহই দুই বেলা ডাক ঘরে হাজিরা দিয়াও আসিতেছেন। কিন্তু কোন জবাবই আর আসিতেছে না।

জিতেন কহিল, "বুড়োদাদা, আপনার নামে যে, ঠিকই উঠেছে, তা এইবার জানা যাচ্ছে ; নইলে রেজেষ্ট্রী চিঠির জবাব না দিয়ে চুপ-চাপই বা থাকে কেন ? দেখুন, দু'দশ টাকা নয়, আধ লাখ ! আপনি হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সব কথা লিখে একখানা চিঠি দিন।"

কেষ্টবাবু কহিলেন, "দিতে হয় ত একেবারে খোদ লাটের কাছেই দেওয়া দরকার।"

বুড়োদাদা তাঁহার নাকটি একটু কোঁচ্‌কাইয়া কহিলেন, "দিতে পার ভাই, বেশ ভাল ক'রে একখানা ঐ রকম চিঠি লিখে ?"

কেষ্টবাবু তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিলেন।

পরের দিন কেষ্টবাবু আর যতীন কি একটা পরামর্শ করিল। যতীন আমাকে কহিল, "তোমাদের সব বলবো এখন।"

বলা বাহুল্য যে, লাট সাহেবের চিঠিখানাতে সর্ব্বৈব ফাঁকি দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, চিঠির ভিতরও কেষ্টবাবু যা'-তা' লিখিয়াছিলেন,

ঠিকানাও যা'-তা' লিখিয়াছিলেন। ঠিকানায় লেখা হইয়াছিল, To His Highness, The Charity Lotterer of Bengal, Darjeeling. যেহেতু, সুবিধা ছিল, মোটামুটি অক্ষর পরিচয় ছাড়া বুড়োদাদার ইংরেজীতে আর জ্ঞান ছিল না। বুড়োদাদা বিশ্বাস করিয়া চিঠিখানা আর কাহারও হাত দিয়া ডাকে দিলেন না; ডাকঘরে গিয়া নিজ হাতেই উহা ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। উহা যে D. L.-আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহারও উপায় ছিল না, যেহেতু পত্রের ভিতর আসল প্রেরকের নাম ঠিকানা কিছুই ছিল না; যাহা ছিল—সে সমস্তই ভূয়া। চিঠিখানা আমি রেজেষ্ট্রি করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু কেদার আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিল, "ও চিঠি কি আর মারা যায়?"

এইবারকার চিঠিতে কিন্তু ফল ফলিল। কয়েকদিন পরেই হাওড়া চ্যারিটী লটারীর আফিস হইতে বুড়োদাদার নামে নিম্নোক্তরূপ এক পত্র আসিল—

মহাশয়,

আপনার টিকিটের নম্বর কত? যদি উহা ২৮৮০৫ হয়, তাহা হইলে পত্র পাঠ আপনার টিকেটখানি আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দিবেন, ইতি।

পশুপতি লাফাইয়া উঠিল, "কখনই না—কখনই না। টিকিট হাত-ছাড়া কিছুতেই করা হবে না। টিকিটখানা একবার দেখি, বুড়োদাদা।"

কিন্তু পশুপতির পশুবুদ্ধিতে সে কি করিয়া বুঝিবে যে, সে-টিকট কি বুড়োদাদা যা'র-তা'র হাতে দেন, না—যেখানে-সেখানে রাখেন? সে টিকিট ছোট্ট একটি জারমান সিল্‌ভারের কৌটায় রাখিয়া, কৌটাটা আর একটা বড় টীনের কৌটায় ভরিয়া, সবশুদ্ধ তাঁহার শুইবার ঘরের মেঝের মধ্যে পোতা আছে।

এইবার গ্রামে আর কাহারো জানিতে বাকী রহিল না যে, বুড়োদাদার নামে ৫০,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে। এতদিন রামচন্দ্রপুরের আকাশে যে ঈষৎ গুরু গুরু মেঘের মৃদুধ্বনি উঠিতেছিল, এক্ষণে তাহা ঘোর নিনাদে সারা গ্রামকে কাঁপাইয়া তুলিল। ছেলে, বুড়ো, যাহার সহিতই বুড়োদাদার দেখা হয়, সে-ই জিজ্ঞাসা করে "টাকা এল, বুড়োদাদা ?"

লটারী আফিসের চিঠিখানা, কেষ্টবাবু আর যতীনের কাণ্ড। সেই যে দু'জনে চুপি চুপি পরামর্শ করিয়াছিল, চিঠিখানা তাহারই ফল। চিঠিখানা তাহারাই লিখিয়া 'হাড়োয়া'র পোষ্টাফিসে পোষ্ট করিয়াছিল।

যাহা হউক, সকলে মিলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইল, টিকিট যেন কিছুতেই পাঠানো না হয়। পশুপতি হঠাৎ বিশেষ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "দেখুন ত বুড়োদাদা, চিঠিখানার ছাপ্ কোথাকার ?" বুড়োদাদা ছাপটা মনে মনে পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—'HAROAH। যতীন তাহা ছিনাইয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে কহিল, "এই যে হাওড়াই ত বটে।"

পরদিন স্কুলে আসিতে বুড়োদাদার একটু দেরী হইল। কিন্তু পদার্পণ করিয়াই তিনি কহিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা, এ গাপ করতে কিছুতেই দিচ্চি না। টাকা ধ্রুব আমার নামে উঠেচে। ভোলাবাবার 'কোথা' মিথ্যা হবার নয়।"

কেদার কহিল, "আর হপ্তাখানেক দেখুন ; এর ভেতর টাকাটা পাঠায় ভালই, নইলে—আর চিঠি-চাপাটি নয়, এবার একেবারে লাটের কাছে গিয়ে সব 'কোথা' খুলে বলা।"

বুড়োদাদা কহিলেন, "কোথাও আর যেতে হবে না। ভোলাবাবা বলেচেন, কাজ অনেক এগিয়ে আসচে। হপ্তা-খানেকের মধ্যেই বাড়ী ব'য়ে টাকা দিয়ে যেতে হবে।"

'উই আর সেভেন্'

পরদিন বুড়োদাদা স্কুলে আসিলেন না। তাহার পরদিনও না। তাহার পরদিনও না। জানা গেল, টাকা দিতে আসিয়া পাছে তাঁহার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যায়, সেই জন্য বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইতে পারিতেছেন না।

তিন দিন পরে ঘর ছাড়িয়া যদিও বাহির হইলেন, কিন্তু স্কুলে আর তিনি আসিলেন না।

* * * *

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন আমরা সাত জন—থুড়ি—ছয় জন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, বুড়ো-বৌদি তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে মধ্যম নারায়ণ তৈল মালিস্ করিয়া দিতেছেন। যে কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন, তিনি 'উন্মাদভঞ্জী' বটীকা প্রভৃতি সেবনের ঔষধও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—হায় বুড়োদাদা! শুধু শুধু তুমি এ কী কাণ্ড ঘটাইয়া বসিলে!

আমরা যাইতেই বুড়োদাদা কট্ মট্ করিয়া আমাদের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "টাকা এনেচ? নোট আমি নোব না, পোকায় কাটবে, নগদ টাকা চাই।" বুড়োদাদার চক্ষু রক্তবর্ণ; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বুড়ো-বৌদি আমাদের দেখিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। হায়! বুড়োদাদা পাগল হইয়া গিয়াছেন!

মনে মনে ভাবিলাম, উহার জন্য কতকটা আমরাও যে দায়ী বটে! অন্তরে ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিলাম, "ঠাকুর! বুড়োদাদার মাথা ভাল ক'রে দাও! তাঁহাকে লইয়া কত আনন্দে, কত উৎসাহে আমাদের স্কুলের সময়টা কাটিত। তাঁহাকে লইয়া—আমরা সাত জন—যে বহুকাল হইতে

আছি। আজ বুড়োদাদা বিহনে আমরা যে একজনও নই। তাই ত বলিতেছিলাম, 'ভেকেসনে'র পর কি অশুভক্ষণেই যে সেই হ্যাট্-কোট্-পরা লোকটা এ গাঁয়ে পদার্পণ করিয়াছিল?

হায় বুড়োদাদা! আজ এক মাস তোমা ছাড়া আমরা ছ'জনে আছি। কিন্তু একটি দিনের তরেও মনে হয় না যে, আমরা সাত জন নই। কত নূতন লোক ছেলে ভর্ত্তি করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আপনারা ক'জন?" উত্তরে আমরা বলি, "আমরা সাত জন।"

সে ইন্সপেক্টার বদলী হইয়া গিয়াছেন। নতুন ইন্সপেক্টার সে দিন আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ক'জন?" আমরা কহিলাম, "আমরা সাত জন।" তিনি গণিয়া বলিলেন, "সাত কোথায়—এই ত ছয়।"

তাঁহার কথা ঠেলিয়া দিয়া, জোর করিয়া আমরা বলিলাম, "না, মহাশয়, 'উই আর সেভেন'।"

কেল্লা-ফতে

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ আচার্য্য মহাশয় বরাবর দ্বিতলে উঠিয়া, যেখানে শিবরাণী বঁটি ও এক ঝোড়া তেঁতুল লইয়া বীচি ছাড়াইতে বসিয়াছিল, তথায় আসিলেন এবং শিবরাণীর উদ্দেশে কহিলেন, "ছেলেকে তলব করেচ কেন গো মা-লক্ষ্মী ?"

শিবরাণী শশব্যস্তে উঠিয়া আসিয়া তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কার্পেটের একখানা আসন বিছাইয়া কহিল, "বসুন বাবা ; দেহটা আপনার ভাল আছে ত ?" বলিয়া তেঁতুলের হাতটা ধুইতে গেল। হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "একটা দরকারে আপনাকে ডাকিয়েছি আচার্য্যি মশাই ! হাতটা একবার ভাল ক'রে দেখতে হবে। প্রত্যেকবারেই চারখানা পাঁচখানা ক'রে লটারির টিকিট কিনে যাচ্ছি ; ওটা যেন কেমন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু একবারও ত এ পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না কিছু। তাই, ক'দিন ধ'রে ভাবচি, আপনাকে দিয়ে একবার হাতটা ভাল ক'রে—"

"বেশ করেচ মা, এসব ব্যাপার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত কিনা, সুতরাং ভাগ্যের ফলাফলটা জেনে এ-সব কাজে নামা উচিত। পাঁজিখানা নিয়ে এসে একবার বোস্‌ দেখি মা, ভাল ক'রে দেখি।"

শিবরাণী ঘর হইতে পাঁজিখানা আনিয়া, গোবিন্দ আচার্য্যির সামনে আসিয়া বসিল। গোবিন্দ পাঁজি খুলিয়া, তিথি-নক্ষত্র-রাশি-গণ মিলাইয়া, শিবরাণীর হাতের রেখার সহিত সে-সবের বিচার করিয়া, অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "শনির বক্র-দৃষ্টি চলেছে খুবই। অষ্টমপতি আর লগ্নপতির

মাঝেই দেখচি একেবারে·····; ওঃ! এই যে রেখাটা দেখচো মা, এইটেই যত অনিষ্ট ঘটাচ্চে! এদিকে বুধ্ একেবারে দ্বাদশে জেঁকে বোসে রয়েচে, অর্থনাশ ত হ'বেই।"

শিবরাণীর মনটা খারাপ হইয়া গেল; বলিল,—"বুধকে ও-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না? অর্থনাশ খুবই হ'চ্চে বাবা! বামুনঠাকুর আর কেষ্টাটার মধ্যে এতদিন ছিল ঝগড়া। কেউ কিছুই স্থবিধে করতে পারত না। ও কিছু গোলমাল করলে, এ এসে ব'লে দিত, এ কিছু গোলমাল করলে, ও এসে বলে দিত। এখন সম্প্রিতি দু'জনে হোয়েচে গলায় গলায় ভাব! আর চার হাত দিয়ে এলোপাতাড়ি চুরি চলচে! তার সাক্ষী এই দেখুন না; এই কি দশ সের তেঁতুল, বাবা? তা'ও সের নিয়েচে সাত পয়সা ক'রে! অর্থনাশের ঘটাটা বুঝুন একবার!"

ট্যাকের পাক খুলিয়া ছোট্ট নস্যের ডিবাটা গোবিন্দ আচার্য্য হাতে লইলেন এবং এক টিপ্ নস্য লইয়া কহিলেন,—"ও আর কিছু আমাকে বল্‌তে হবে না মা, অর্থনাশ হ'তেই হবে; শাস্ত্র ত আর মিথ্যে হবার নয়; 'সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ং ঃ সৌরিঃ করোতি বৈকল্যং রবেরন্তর্গতে শনৌ।'—শনিকে না তুষ্ট করতে পারলে, ঠাকুর-চাকরের অত্যাচারও কমবে না, আর লটারীতে কিছু ওঠা—তারও কোন আশা ভরসা নেই। আমি বলি কি, তিনটে মাস শনিবার শনিবার শনিপূজোর একটু ব্যবস্থা কর মা! তা হোলেই শনি একটু তুষ্ট হবেন; তখন লটারীর টিকিট কিনো।"

"তা' হোলে, এখন আর কিনবো না?"

"না;—টাকাগুলো যদি জলে ফেল্‌তে না চাও।"

অতঃপর প্রতি সপ্তাহে শনিপূজার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রামবাবু অর্থাৎ

বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তিনি এই-সবের ঘোর বিরোধী। বিশেষতঃ, গোবিন্দ আচার্য্যির প্রতি তিনি বিশেষ চটা। আচার্য্যির ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধে এ যাবৎ তিনি শিবরাণীকে অনেক বুঝাইয়াও গোবিন্দের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিল পরিমাণও কমাইতে সমর্থ হ'ন নাই। সুতরাং স্থির হইল, তিন মাস ধরিয়া প্রতি সপ্তাহে শনিপূজা করিতেই হইবে ; তবে পূজাটা এ বাড়ীতে না হইয়া গোবিন্দের বাড়ীতেই হইবে। শিবরাণী বারো শনিবারের পূজার ব্যয় বাবদ দুইখানি দশটাকার নোট গোবিন্দের হাতে দিয়া প্রণাম করিল এবং গোবিন্দ আর এক টিপ্ নস্য নাসারন্ধ্রে গুঁজিয়া সজল নেত্রে ও প্রসন্ন চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছু পরেই রামবাবু বাহির হইতে গৃহে ফিরিলেন, এবং হাতমুখ না ধুইয়াই আগে দেরাজ খুলিলেন এবং তন্মধ্যস্থিত নোটের তাড়াটার নোটগুলি পুনঃ পুনঃ গণিতে লাগিলেন। তিন-চারিবার গণিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া হাঁকিলেন—"হ্যাঁ গা ?" কিন্তু 'হ্যাঁ গা'র কোন সাড়া-শব্দ নাই। সে তখন একান্ত মনে পুনরায় তেঁতুলের বীচি নিষ্কাশন কার্য্যে রত।

"শুনতে পাচ্চ না ? ওগো !"

শিবরাণী শুনিতেও পাইয়াছিল এবং বুঝিতেও পারিয়াছিল। গম্ভীর-ভাবে সাড়া দিল, "কি বোলচ ? কাণের মাথা খাইনি, শুন্তে পাই।"

"দু'খানা নোট কি হ'ল ?"

"আমি এই তেঁতুলের সরবৎ ক'রে তাই দিয়ে গুলে' খেয়েচি।"

"গুলে' খেয়েচ, কি গোল্লায় দিয়েচ, যা হোক কিছু-একটা করেচ নিশ্চয়। ৩৫খানা থেকে পাঁচ আর তিন ৮খানা গেলে ২৭খানা থাকবে ত ?"

"নেই ২৭খানা ?"

"না, ২খানা নেই।"

"না থাকবার ত অপরাধ নেই। বুধ দ্বাদশে এসে যখন জেঁকে বসেচে, তখন এ রকম হবেই। নইলে, এই কি তোমার গিয়ে দশ সের তেঁতুল! আর সাত পয়সা ক'রে সের এনেচে; বলে, 'কি করব মা, যুদ্ধেতে সব অগ্নিমূল্যি হোয়েচে।' তা তেঁতুল দিয়ে কি কামানের গোলা তৈরী হচ্চে! এমন অনাছিষ্টি কথাও জন্মে শুনি নি।"

"চুলোয় যাক তোমার তেঁতুল। এখন নোট ছ'খানা হ'ল কি?"

"ঐ যে বললুম, তেষ্টা পেয়েছিল, সরবৎ ক'রে খেয়েচি।"

রামবাবু আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না; করিয়া কোন ফল নাই। ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার পথে তিনি গোবিন্দ আচার্য্যিকে এই দিক্ দিয়াই যাইতে দেখিয়াছেন; এবং শিবরাণী যে তার এক জন বিশিষ্ট ভক্ত, তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং নোট দুইখানি বেশ শক্ত দুই দুইটি পাকে যে তাঁরই—টাকশালে নয়—ট্যাঁকশালে বন্দী হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কিছু আর বলিলেন না, নীরব রহিলেন। শুধু মনে মনে গোবিন্দ আচার্য্যির চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে লাগিলেন। শিবরাণীকেও তাঁহার গালি দিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু শিবরাণীর রাশি-নক্ষত্রের এমন জোর ছিল যে, কখনও তাহার বিরুদ্ধে—সামনা-সামনি ত নয়ই—মনে-মনেও কোন কিছু বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না।

শিবরাণীও আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে তেঁতুল ছাড়াইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, 'আচার্য্যি মশায়ের ওপর ওঁর যে-রকম আক্রোশ, আজকের ব্যাপার চেপে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল। কি-কথায় কি বোলে ফেলবো আর শনিপূজোর ব্যাপারটা ফাঁস হ'য়ে যাবে। দরকার নেই আর ও-কথায়।'

খানিক পরে রামবাবু আবার জামা-কাপড় পরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। শিবরাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার বেরুচ্চ কোথায় ?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে রামবাবু কহিলেন, "বায়োস্কোপ, বায়োস্কোপ।"

শিবরাণী কহিল, "বুড়ো বয়সে সখের ত দেখচি সুমোর নেই !"

শিবরাণীর রাশি-নক্ষত্র যদি জোরালো না হইত, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া এ কথার উত্তর ভাল করিয়াই রামবাবু শুনাইয়া দিয়া তবে ছাড়িতেন। এ-ক্ষেত্রেও তিনি নীরব থাকিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পথের মোড়ের কাছে আসিতেই তাঁহার গমনে বাধা পড়িল। বেহালার ফণীবাবু আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন ;—কহিলেন, "তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম যে !"

ফণীবাবু রামবাবুর বাল্যবন্ধু। আলিপুর-কোর্টে ওকালতি করেন। বর্ত্তমানে বেহালায় বাড়ী করিয়াছেন।

রামবাবু কহিলেন, "হঠাৎ এ দিকে যে ? খবর সব ভাল ?"

"খবর সবই ভাল। ছোট ভাইয়ের ত আর বে না দিলে চলে না ; ২৭।২৮ বছর বয়েস হোল ত। তার জন্মে একটি পাত্রী দেখতে এসেচি। তোমাকে যেতে হবে ভাই ! বেশী দূর নয়, এই বাগবাজারে—নিরাকার ষ্ট্রীট।"

"কিন্তু আমি বায়োস্কোপে যাবার জন্মে বেরিয়েচি, একটা নতুন—"

"নতুন একদিনেই আর পুরানো হয়ে যাচ্ছে না, কাল দেখবে। চল, যেতেই হবে", বলিয়া—ফণীবাবু একরকম জোর করিয়াই রামবাবুকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

* * * * *

'উই আর সেভেন্'

গত সন্ধ্যায় নিরাকার ষ্ট্রীটে মেয়ে দেখিয়া আসিবার পর হইতেই—রামবাবুর যেন মানসিক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। আহারে রুচি নাই, চোখে নিদ্রা নাই; মনে স্বস্তি নাই; মন অত্যন্ত অস্থির, এবং তাহার গতি অত্যন্ত এলো-মেলো। কোন-একটা অবস্থায় দু'দণ্ড মন স্থির করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। একবার চেয়ারে হেলান দিয়া বসিতেছেন, একবার মেজের উপর শুইয়া পড়িতেছেন, একবার বাহিরের বারান্দায় পাইচারী করিতেছেন। কখনো জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখিতেছেন, কখনো দেয়ালে-ঝুলান ঠাকুরদাদার আমলের রাম-সীতা-হনুমানের পটখানার মধ্যে হঠাৎ কোন নতুনত্ব দেখিয়া স্থিরদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; আবার কখনো বা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিছানায় ঢলিয়া পড়িয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে কড়িকাঠ সম্বন্ধে মনে-মনে কোনরূপ গবেষণা করিতেছেন। দুপুরবেলা আহারাদির পর জামা গায়ে চড়াইয়া রামবাবু জুতার ফিতা বাঁধিতে বসিলে, শিবরাণী কহিল—"নাকে-মুখে ভাত গুঁজেই বেরুনো হচ্ছে কোথায়?"

"পার্কটায় এক পাক ঘুরে আসি।"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শিবরাণী কহিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হো'ল? এই বোশেখী দুপুরের রোদে যাচ্ছ পার্কে ঘুরে বেড়াতে!"

"ওঃ!" বলিয়া রামবাবু বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং বসিয়া পড়িয়া জুতা জামা খুলিতে লাগিলেন।

শিবরাণী কহিল—"তোমার হ'ল কি? এত বলি যে, একটু বেশী ক'রে মাথায় জল ঢেলে চান করো, তা কিছুতেই করবে না—। ওই ছিরিক ক'রে দু' মগ জল মাথায় ঢেলেই ব্যাস্ হোয়ে গেল! সকালে বললুম—এক-পো সুজি আনতে, আনলে কি না—পাঁচ-পো বিড়ঙ্গ! তোমার হোল কি?"

বেশ-একটু বিরক্ত হইয়া এবং মুখখানা বাঁকা করিয়া রামবাবু বলিলেন—"হবে আবার কি? কিছু হয়-টয় নি।"

"নিশ্চয় হোয়েচে, আলবৎ হোয়েচে!" বলিতে বলিতে শিবরাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল—"ঘরে মকরধ্বজ কেনা রয়েচে; কাল থেকে মাখন-মিছরি দিয়ে খেতে সুরু কর; আর না হয়, ফটিক ডাক্তারকে দেখিয়ে একটা ভাল ওষুধ-টোষুধ কিছু খাও। শেষকালে কি আমাকে দ'য়ে মজাবে!"

এবার আরও উচ্চকণ্ঠে এবং আরও কিঞ্চিৎ বিকৃত মুখে রামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"কিছু হয়নি আমার,—কিছু হয়নি আমার!"

কিন্তু কিছু-একটা হইয়াছে যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই হইয়াছে। তরশু মঙ্গলবার কিছু হয় নাই। পরশু বুধবারও কোন-কিছু হইবার অবসর ঘটে নাই। কাল বৃহস্পতিবারও সকাল ও দুপুরে এমন কিছুই ঘটে নাই। ঘটিয়াছে কাল বৃহস্পতিবার বারবেলায় গৃহ হইতে বাহির হইবার পর। কি কুক্ষণেই যে ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা হইল! কি অশুভ মুহূর্ত্তেই যে তাঁহাকে নিরাকার ষ্ট্রীটে যাইতে হইল! মেয়ে দেখিয়া আসিয়া কাল সারা রাত রামবাবু চোখের দু'পাতা এক করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তরে রেখার মুখখানা সারাক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার মনকে নাচাইয়াছে, দোলাইয়াছে, উঠাইয়াছে, নামাইয়াছে, আঘাত করিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে। ভোরের দিকে মানস-চক্ষে রেখার মুখ দেখিতে-দেখিতেই অল্প কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, আবার রেখার মুখ দেখিতে-দেখিতেই সে তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত সকালবেলাটা এ মাসের 'বঙ্গ-কুসুম' মাসিক পত্রখানায় 'রেখার ডায়েরী' নামে যে ছোট গল্পটা বাহির হইয়াছে, তাহা

বার বার পাঠ করিয়াছেন ; তাহার পরে কাগজ পেন্সিল লইয়া নানাপ্রকার দাগ কাটিয়াছেন আর মনে মনে বলিয়াছেন, 'সরল-রেখা', 'বক্র-রেখা', 'রেখা-চিত্র' ইত্যাদি। তার পর, দোকান হইতে এক পোয়া সুজি আনিতে গিয়া পাঁচ পোয়া বিড়ঙ্গ আনিয়াছেন। এখন বিছনায় শুইয়া-পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ—

আহা কি সুন্দর! কিবা মনোহর! মুখের এমন সুডৌল ভাব বড়-একটা দেখা যায় না। মনে হয়, মুখখানার দিকে চিরকাল ধ'রে চেয়ে থাকি। যেমন চোখ, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি কাণ, তেমনি গাল! যেন ফুটন্ত গোলাপ! মাথার চুলেরই বা কি বাহার! 'সে এমনি-ক'রে চেয়ে গেল ক'রে মন চুরি!' আর সুন্দর ত অনেকই চোখে পড়ে, কিন্তু কি সাংঘাতিক সুন্দর সে। উঃ!—না, যাক্, আর ভাব্‌বো না। ভেবে শুধু-শুধু কষ্ট পাওয়া। চুলের যে গোছা-দুটো দু'কাণের জুল্‌পীতে নেবে পড়েচে, তাই বা কি সুন্দর! তাই ত, কি করা যায়। যাক্—চুলোয় যাক্।—উঃ, কি বেজায় গরম পড়েচে! আজ কি বার? এবার আমের দফা রফা! বিষ্টিই হোল না, বোটা শক্ত হ'তে পেলো না, কচি বেলাতেই সব বোঁটা খসে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামনের বাড়ীটার ছাদে মেরাপ বাঁধচে, সেই মেয়েটার বিয়ে বোধ হয়, যাকে সকলে খুব সুন্দর বলে। মেয়েটা সুন্দর বটে, কিন্তু রেখার সঙ্গে তুলনায় ও তার বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলের'ও যোগ্য নয়। আহা-হাঃ, ভগবান যেন—দূর ছাই! আচ্ছা, দেশের যত কাক, সবগুলোরই কি আড্ডা এই কোলকাতায়! কৈ—পাড়াগাঁয়ে ত এত—ওঃ! ফণীকে যে একখানা চিঠি দিতে হবে; অনেক করে বোলে গেছে।"

রামবাবু কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন। খানিকক্ষণ ধরিয়া

গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন। তাহার পর আপন মনে কহিলেন, 'দোয়া যা'ক্ এক বোমা ছেড়ে, যা হয় তা' হবে।' বলিয়া ফণীবাবুকে এইভাবে পত্রাঘাত করিলেন,—

'ভাই ফণি, তোমার অনুরোধ মত নিরাকার ষ্ট্রীটের কনেটির সম্বন্ধে আজ প্রাতে অন্যান্য যাবতীয় খোঁজখবর লইয়াছি। অন্য কাহারও কাজ হইলে, আমি এত করিয়া পরিশ্রমও করিতাম না আর ব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিতেও বসিতাম না। তোমার ছোট ভাই আর আমার ছোট ভাই —আমি ত পৃথক্ বলে মনে করি না—এ আমার ঘরেরই ব্যাপার বোলে মনে করি। যা'ক—বলি ভায়া! সম্বন্ধটি কোন্ ধুরন্ধর এনেছিলেন? পত্রে পাত্রীর গুণের আলোচনা করিব না। ভায়ার পাত্রীর জন্য অন্যত্র চেষ্টা কর। আমিও চেষ্টা করিতে থাকিলাম। ভাগ্যিস্ ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভায়ার বিয়ে হইয়া যায় নাই, এই রক্ষা। এর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। ইতি।'

চিঠিখানা খামে আঁটিতে আঁটিতে রামবাবু নিজের মনে বলিলেন— 'কেল্লার একটা দিক্ ত ঢসিয়ে দিলুম, দেখি, মাণিকের মুকুট দখল করতে পারি কি না!'

পত্রখানা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তখনি তিনি জামা-জুতা পরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শিবরাণীর একটু আগের কথাগুলি মনে করিয়া আর বাহির হইতে সাহস করিলেন না। শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

বৈকালের দিকে রামবাবু চিঠিখানা পকেটে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাহা ডাকবাক্সে দিয়া ভাবিলেন,—"কোথায় যাই? পার্কে? ভাল লাগে না। বায়োস্কোপ? তাতেও মন লাগচে না। বাড়ী

ফিরে যাব? বাড়ীতেও ত মন টেঁকে না। নতুন দোকানটায় গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এলে হয়।"

নতুন দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কি-ভাবিয়া ঢুকিলেন না। এক-পা এক-পা করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। অবশেষে বাগবাজারের পথ ধরিয়া নিরাকার ষ্ট্রীটের দিকে পা-দুটাকে ধীরে ধীরে চালাইয়া দিলেন।

সেই একতালা ছোট্ট বাড়ীটা: যাহার ভিতর ভগবান শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য রাখিয়াছেন। রামবাবু বিপরীত দিকের ফুটপাতে মুড়কী-বাতাসার দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া বাতাসার দর-দস্তুর করিতে সুরু করিলেন। দোকানী কহিল—"গ্যাহেন কর্‌তা, জিনিসডা একবার ভাল কইর‍্যা গ্যাহেন।" একতলা বাড়ীর খোলা জানালা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া রামবাবু কহিলেন, "তা ব'লে তের আনা সের যে বড্ড বেশী দাম বলচ বাপু!"

"তের আনা কি করতা, স্যার পাচ আনা কইলাম।"

ঐ—ঐ—ঐ রেখা আসিয়া দাঁড়াইল।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যার পর পাঁচ পোয়া বাতাসা হাতে করিয়া রামবাবু গৃহে ফিরিলে, শিবরাণী কহিল—"এ কি কাণ্ড! ওবেলা বিড়ঙ্গ, এবেলা বাতাসা! এত বাতাসা কি হবে? বিড়ঙ্গ দিয়ে ভিজিয়ে খাবে না কি?"

"সংসার করতে হলে বিড়ঙ্গও চাই, বাতাসাও চাই।"—গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়া রামবাবু বরাবর উপরে উঠিয়া গেলেন।

রাত্রে রামবাবুর চোখে নিদ্রা আসে না। এ-পাশ ও-পাশ করিয়া ঘড়ি বাজার ঘণ্টা গণিতে লাগিলেন আর নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

'কি করা যায় ? সবদিক্ রক্ষা কোরে কাজ হাসিল করা বড় সোজা কথা নয়। ফণীকে না হয় এক ঘায়ে কাৎ করা গেল ; কিন্তু রেখার বাবাকে ......! সবার ওপর, ঘরের গিন্নীটিকে কায়দায় আনা—সেইটাই ত অসাধ্য ব্যাপার ! তা হোলে ত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে !'—রামবাবু একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। পরক্ষণেই রেখার মুখখানা অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়া অন্তরকে বলীয়ান্ করিয়া তুলে, উৎসাহে হৃদয়-মন নৃত্য করিতে থাকে।

সারারাত্রির অনিদ্রার পর সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া রামবাবু চায়ের জন্য হাঁক-ডাক করায় শিবরাণী আসিয়া কহিল—"বলি, চায়ের কি কল বসানো আছে যে, টিপ্‌বো আর পেয়ালা ভর্ত্তি ক'রে আনব ? হাত ত এই দুটো।"

"তা' কি করব বল ? আর দু'টো হাত ত কাঁধে জুড়ে দেবার উপায় নেই।"

শিবরাণী কথাটা অন্যপথে লইয়া গেল ; কহিল—"থাকবে না কেন, করলেই আছে। যেমন তোমার সেই বন্ধু নগেনবাবু করেচে। ও একটা গাড়োল ! এক বউ থাকতে কোন্ ভদ্দর লোক আবার একটা বিয়ে করতে পারে ! আমি হোলে ওর নাক-কাণ কেটে, দু'টো বউ নিয়ে ঘর করার মজাটা টের পাইয়ে দিতুম।"

"অতি যাচ্ছেতাই অতি—যাচ্ছেতাই ! ও লোকটাকে তাই আমিও দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বলি, বিয়ে করাটা কি ছেলে-খেলা ! পঞ্চ-পাণ্ডব ত অন্ততঃ পাঁচটি বৌ ঘরে আন্‌তে পার্‌তো, কিন্তু নিয়ে এলো—একটি ; অর্থাৎ প্রত্যেকে এক-পঞ্চমাংশ বিয়ে করলে, একটা কোরে দু'টো কোরে ত দূরের কথা। এ থেকেও লোকের শিক্ষা হয় না ! আশ্চর্য্য !"

রামবাবুর চা-খাওয়া মাথায় উঠিয়া গেল। তাঁহার অন্তঃকরণে এক-দিকে ভয়, একদিকে বিরক্তি সমান ওজনে জমিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শিবরাণীর ভয়টাই বড় হইয়া সঞ্চিত বিরক্তিকে ঢাকিয়া ফেলিল। তিনি কহিলেন, "আমরা ত ও-সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। এই ধর, তুমি যে আমার স্ত্রী,—অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী। তুমি আমার জীবনেও সঙ্গিনী, মরণেও সঙ্গিনী। অর্থাৎ আমি ম'লেও এ সম্বন্ধ—"

বাধা দিয়া শিবরাণী কহিল—"হোয়েছে; ও-সব অলুক্ষণে কথা আর মুখে আনতে হবে না।" বলিয়া বারান্দার ও-ধারে যেখানে ষ্টোভে চায়ের জল ফুটিতেছিল, শিবরাণী সেই দিকে গেল।

রামবাবু বসিয়া বসিয়া যেন পাতাল-প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন! "না! বৃথা চেষ্টা, আর অনর্থক মন খারাপ করা। সব দিক্ কায়দা করে নিতে পারব, কিন্তু এই দুর্জ্জয় মেয়েমানুষটিকে কায়দা করা আমার সাধ্যের অতীত। নগেনবাবু বাইরের লোক—একজন পর—সে দুই বিয়ে করেচে বলে তার ওপর এই রাগ, আর আমি যদি করি, তা হোলে কি আর রক্ষে আছে! নাঃ! ও সব ঘটে উঠবে না; বৃথা চেষ্টা। রেখা-লাভ আর ভাগ্যে নেই। মিছি-মিছি মনকে ব্যস্ত ক'রে কোন ফল নেই। সব ভুলে যাওয়া যা'ক। বিল্বমঙ্গলের মত চিন্তামণিকে ভুলে সেই পরম-চিন্তামণি-পদে প্রাণ-মন সমর্পণ করা যা'ক। ইহকালের সকল দুঃখ পরকালে সুখ হোয়ে ফুটে উঠবে।"

সকাল-সকাল স্নানাহার শেষ করিয়া রামবাবু সেই পরম চিন্তামণিপদে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে কালীঘাটে কালীদর্শনে রওনা হইলেন। সেখানে কালীদর্শন করিয়া হাড়ি-কাঠতলার সম্মুখে নাট-মণ্ডপে বসিয়া লোকের ভীড় দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি প্রৌঢ় বয়স্ক লোককে দেখিতে পাইয়া দ্রুত-

পদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "এই যে! নমস্কার। কালীদর্শনে এসেচেন বোধ হয়?"

লোকটি রামবাবুকে চিনিয়া ফেলিলেন; কহিলেন,—"হ্যাঁ। ভাল আছেন ত? নমস্কার। আপনার ফণিবাবু ত আর কোন খবর দিলেন না।"

লোকটি রেখার বাবা। উভয়ে নাট-মণ্ডপের একাংশে উপবেশন করিলেন।

দিবাকরবাবু অর্থাৎ রেখার বাবা কহিলেন—"মেয়েটি আমার বড় হোয়ে উঠেচে, সুতরাং ওর বিয়ের জন্যে আমাকে একটু ব্যস্ত হোয়ে পড়তে হোয়েচে। এবং শুধু ব্যস্ত নয়, একটু ভাবিতও ক'রে তুলেচে। কারণ, তেমন অর্থসঙ্গতি ত নেই।"

রামবাবু সম্মুখে কালী-প্রতিমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, —"ভাবনার কোন দরকার নেই। সকল ভাবনা ঐ পায়ের তলায় ফেলে দিন; ঐ বেটীই সব যোগাযোগ ক'রে দেবেন।"

"আচ্ছা, আত্মীয় মনে করে আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, মেয়েটিকে ফণিবাবুর পছন্দ হয়েছে ত?"

একটু গম্ভীর হইয়া রামবাবু কহিলেন, "পছন্দ ত হবেই।"

"তবে, কোন সংবাদ ত আর দিলেন না।"

"না দিয়েছেন, ভালই হোয়েচে।"

একটু চমকিত হইয়া দিবাকর কহিলেন,—"কেন—এ কথা বলচেন কেন?"

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া রামবাবু কহিলেন,—"নাঃ, এই দেবী-স্থানে আপনি আমাকে মহা মুস্কিলেই ফেল্লেন। এখানে বসে মিথ্যা কথা কি ক'রে বলি?"

অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত দিবাকর রামবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কি ব্যাপার আপনাকে বলতেই হবে, না বল্লে কিছুতেই ছাড়বো না।"

"মহা মুস্কিলে ফেললেন আপনি। তীর্থস্থানে—দেবীর সামনে বোসে···"

ব্যাপারটা সঙ্কট-জনক হইয়া পড়িল। তীর্থস্থানে, দেবীর সামনে বসিয়া রামবাবু মিথ্যা কথাটাও বলিতে পারেন না; আবার কিছু না বলিলেও দিবাকর ছাড়েন না। সুতরাং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রামবাবু কহিলেন—"কন্যার অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা দেখুন।" শেষ পর্য্যন্ত দিবাকরের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে কারণটাও বলিতে বাধ্য হইলেন, কহিলেন—"টি, বি,—টি, বি······থাইসিস্; বাপও ঐ রোগেই গিয়েচে কি না।"

দিবাকরের চক্ষু কপালে উঠিল।

রামবাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"এদের কথা ভুলে যান; অন্য চেষ্টা করুন! অমন মেয়ে আপনার, বিয়ের ভাবনা কি? সকলে মিলে চেষ্টা করলে, ভাল পাত্র জুটবেই। মেয়ে আপনার সু-লক্ষণা, সুতরাং ভাল হাতেই পড়বে।"

আরও কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর স্থির হইল, রামবাবু কাল প্রাতে দিবাকর বাবুর বাসায় যাইবেন ও তাঁহার দ্বারা পাত্র অনুসন্ধান-কার্য্যে যতটা সাহায্য সম্ভব, তাহা তিনি করিবেন। মনে মনে রামবাবু ভাবিলেন, 'এদিকেও কামান দাগলুম; দেখা যা'ক, কতদূর কি হয়।'—রেখার কথা আবার নূতন করিয়া তাঁহার অন্তরে আশা ও উৎসাহের আলোক জ্বালিয়া দিল।

বৈকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একটু অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িলেন। নিরাকার ষ্ট্রীটে গিয়া সদুপদেশ ও সাহায্য দান করিবার জন্য তিনি অতি-

মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। অথচ সকালে যাইবার কথাই হইয়াছে। হউক। তিনি সেই অপরাহ্ণেই বাহির হইয়া পড়িলেন। রেথাকে যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই তাঁর অসীম তৃপ্তি, অতুল সুখ।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আইসক্রীমের ছোট ছোট গাড়ীগুলি এদিক-ওদিক যাইতেছে। ছোকরা ও আফিংখোরের দল চায়ের কেবিনগুলিতে আসর জমাইয়াছে। দৈনিক কাগজের ফেরীওয়ালা একপিট-সাদা একখণ্ড সান্ধ্য-সংস্করণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া বিক্রয় করিতেছে...'জোর খবর! ভোট্-ভোট্ শেষ হইলো! সুবোশবাবু হিন্দুকে গলা টিপিলো!' কলেজের তরুণ-তরুণীরা পূর্ব্ব পরামর্শ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী, হয়—পার্কের পথে পাক দিয়া হাস্য ও গল্পে চলা-চলি করিতেছে, নয়ত-বা একান্তের কোন-এক বেঞ্চে বসিয়া গলা-গলি করিতেছে। যে সমস্ত ছোকরা ফোতো-বাবুর অন্নাভাবে সারাদিন অনাহারে কাটিয়াছে, এক্ষণে তাহারা দুই-পয়সায়-ডাইং-ক্লিনিং-এ-কাচা একমাত্র ধব্‌ধবে জামা-কাপড় পরিয়া, বিনা-পয়সায় ঝাঁপ্‌ড়ি-টেরী উড়াইয়া, আধ পয়সার পানের খিলি চিবাইতে চিবাইতে ও আধপয়সার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সিনেমার ভীড় বাড়াইতে চলিয়াছে। দু'একটা বেহারী গোয়ালা, খাঁটি দুগ্ধ-ভক্ত বাঙালী বাবুর গৃহে সাম্‌নে-দোহা পৃথিবীবৎ দুগ্ধ অর্থাৎ...তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল-মিশ্রিত দুগ্ধ...যোগান দিয়া, এক্ষণে তাহার সেই বিশালকায় গরু এবং শীর্ণকায় বাছুর তাড়াইয়া এবং সেই সঙ্গে পথিকদের সন্ত্রস্ত করিয়া, মহানন্দে 'তু কালা নটবর' সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বস্তীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

'উই আর সেভেন্'

বাগবাজার নিরাকার ষ্ট্রীটে দিবাকরবাবুর বাসা। একখানি ঘরের মধ্যে মুখোমুখী বসিয়া—দিবাকর ও রামবাবু।

দিবাকর কহিলেন, "আপনিই দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন। তা হোলে বুঝবো—রেখার সত্যিই ভাগ্য ভাল।"

দিবাকর রামবাবুর হাতদুটি চাপিয়া ধরিলেন।

রামবাবু কহিলেন, "আপনাকে এত ক'রে বলতে হবে না। আমারই কতবার মনে হয়েচে যে, এই সব বিষয় সম্পত্তি, চক্ষু বুঁজলেই, সেই আমার বাঁদর শালাটি এসে ভোগে লাগাবে। ছেলে-পুলে ত এ-স্ত্রীর হয়নি, আর হবেও না। সে গুড়ে বালি! আমার অবর্ত্তমানে সেই নচ্ছার, পাজী, মুখ্যুটা যে সব দু' হাতে লুটবে, আর মহা ফূর্ত্তিতে ভোগ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে আমার প্রাণ-বিহঙ্গ দেহপিঞ্জরে সজোরে মাথা ঠোকে আর খাবি খায়! তা আপনাকে আর এ জন্যে…"

কথা শেষ হইতে পাইল না। রেখা এক ডিবা পান হাতে করিয়া বাপের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে-সঙ্গেই রামবাবুর দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু সেখান হইতে ছিট্‌কাইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল—রেখার মুখের দিকে।

বাপের হাতে পাণের ডিবা দিয়া রেখা চলিয়া গেলে, রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ে—বয়স কত হ'লো?"

"এই উনিশে পড়ল আর কি।"

রামবাবু তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব করিয়া ফেলিলেন—উনিশ আর উনচল্লিশ, তফাৎ তো মোটে কুড়ি বছরের; নাঃ, নেহাৎ বে-মানান্ হবে না। তা-ছাড়া বাড়ন্ত গড়ন আছে।

অতঃপর আরও ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ের মধ্যে যে-সব কথাবার্ত্তা

আলাপ-আলোচনা হইল, তাহার ফলে উভয়েরই মন আশায় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রামবাবু মনে মনে কহিলেন—'একে একে ত সব 'ক্লীয়ার' করলুম, এইবার একটু শক্ত পাল্লা। দেখা যাক।' অন্তরে তাঁহার আনন্দের ফোয়ারা উপ্চাইয়া পড়িতেছিল।

রাত প্রায় দশটার সময় রামবাবু বাড়ী ফিরিলে শিবরাণী কহিল, "বায়োস্কোপে গেছলে বোধ হয় ?"

"নেহি বিবিসাব! হেমবাবুকো ছেলিয়াকা বেমার হুয়া হায়, উসিয়াস্তে দেখনেকো গিয়া থা।"

"এ আবার কি ঢং ?"

"ঢং নয়; আইন হোচ্চে, বাংলায় আর কথা-টথা বোলতে পারবে না, হিন্দীতে বলতে হবে। এখন থেকে সেটা অভ্যেস করা ত দরকার।"

"হেমবাবুর ছেলেটার আবার অসুখ করেচে ?"

"আবার। এবার একটু বেশী বেশী।

"তা ওরা আচার্য্যি মশাইকে একবার ঠিকুজিটা, হাতটা দেখাক না। খারাপ দশা পড়েচে নিশ্চয়। উনি একবার দেখলেই সব বুঝতে পারবেন আর ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"আচ্ছা—গোবিন্দ আচায্যির ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস, না ?"

বিশ্বাস কি শুধু শুধু হয় ? আমার বিয়ের আগে বাবার অত-বড় মকদ্দমাটা কত সহজে জিতিয়ে দিলেন। আজ যেন উনি এদিকে এসে আছেন, বরাবরই ত আমাদের ভবানীপুরেই থাকতেন। রজনী মিত্তিরের বৌটাকে বড় বড় ডাক্তারদের কেউ দেখতে বাকী রাখেনি। বৌটা মরতে বসেছিলো; উনিই ত ঝাড়-ফুঁক্ ক'রে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। উনি ত

শুধু জ্যোতিষী ন'ন, খুব ভাল ঝাড়-ফু ক্ জানেন। আবার কত রকম ওষুধ-পত্তর, মাদুলী, কবচ—। তোমাদের বিশ্বাস নেই, তাই—"

"খুব বিশ্বাস আছে। তোমার যখন আছে, তখন আমার কি না-থেকে পারে ?"

"আমার বিয়ের সময় উঁনি গুণে যা বলেছিলেন, ঠিক তাই ত হোল। আমার ত সম্বন্ধ ঠিক-ঠাক হোয়েছিল—নৈহাটীতে ; কিন্তু উনি বলেছিলেন—"ওখানে কিছুতেই হবে না, কোলকাতাতেই হবে'—তাই ত ঠিক হোল। আমার মাথা-ধরার জন্যে বলেছিলেন—'মা, রোজ একটু করে রামায়ণ পোড়ো।'—তা আর আমার হোয়ে উঠলো না।"

"আমাকেও বলেছিলেন—'শিব-রাত্রি'র দিন উপোস করতে, আমারও তা হোয়ে উঠলো না।"

একটু বিরক্ত হইয়াই শিবরাণী কহিল, আজ রস যে খুব উপচে উঠেচে দেখচি! কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসের কথা শোনবার ত আমার সময় নেই ; রাত দশটা বেজে গিয়েচে"—বলিয়া শিবরাণী রামবাবুর খাবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া গেল। রামবাবু মনে মনে বলিলেন—"আচায্যি মশায়ের ওপর আমারও অগাধ বিশ্বাস, গিন্নী! এ অকূল সমুদ্রে তিনি ছাড়া আর পারের ভরসা নেই। কাল সকালেই তাঁর শরণ নেবো।"

সত্যই পরদিন সকালে রামবাবু গোবিন্দ আচায্যির কাছে গিয়া হাজির হইলেন। হঠাৎ পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয়ের মত রামবাবুকে তাঁহার কাছে আসিতে দেখিয়া তিনি প্রথমটা ভড়কাইয়া গেলেন। রামবাবু অতি ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইলেন। চমকিত অন্তরে গোবিন্দ আচায্যি রামবাবুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কল্যাণ হোক।"

রামবাবু কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ সফল করাতে হবে, ঠাকুর; কল্যাণ করাতেই হবে।"

গোবিন্দ মানুষ-রাখাল; অর্থাৎ মানুষ চরাইয়া জীবিকার্জ্জন করেন, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রামবাবু কহিলেন, "আনুপূর্ব্বিক সব খুলে না বললে, বুঝতে পারবেন না, বাবা। সবই আমি বলচি। মতলব আমার, আপনি শুধু মাঝে থেকে আমায় সাহায্য করবেন। আর তার জন্যে আপনার শ্রীচরণে প্রণামী নগদ পাঁচ শ'খানি রজত মুদ্রা! তার ভেতর এই দু'শো আজ 'য়্যাড্‌ভান্স' প্রণামী ধরুন।"—এক তাড়া নোট রামবাবু গোবিন্দ আচার্য্যির পদপ্রান্তে রাখিলেন।

গোবিন্দ আচার্য্যির মত চতুর লোকেরও এবার ভ্যাবা-চ্যাকা লাগিয়া গেল। তাহার পর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া রামবাবুর নিকট সমস্ত শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ধাতস্থ হইল। সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিত বলিয়া রামবাবু কহিলেন, "দুটো পূজো, কি গ্রহশান্তি ক'রে আমার ওখান থেকে কি ছাই আর আপনার প্রাপ্তি হয়। পাঁচ সিকে, ন' সিকে, বড় জোর না হয় পাঁচটা কি দশটা টাকা—এই ত? আর এ ব্যাপারে এক দমে একেবারে কর্‌করে পাঁচটি শো! তারপর শুধু এইখানেই শেষ নয়। এর আবার 'বাই-প্রডাক্টস' (By-products) আছে। ঘরে দু' পাঁচটা ছেলেপুলে না থাকলে আপনাদের রোজগার হবে কোত্থেকে, এটা হোলে আশা করা যায় দু-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে হবেই। তখন আপনাদের উপায়ের নানান্ পথ খুলে যাবে, লক্ষ্মী পূজো, ষষ্ঠী পূজো, অন্নপ্রাশন, ফাঁড়া-কাটান—কত কি! বুঝতেই পারছেন ত?"

এবার একগাল হাসিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "খুব বুঝেছি, বাবাজী; তুমি

নিশ্চিন্ত থাক ; ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে ফটিক ডাক্তারকেও ঠিক করে রেখো। ধারে-ভারে কাটে কি না।"

"আজই দুপুরবেলা তার কাছে যাব। ডাক্তারখানায় বোসে এ সব কথার আলোচনা চল্‌বে না; আর, কারো সাম্‌নেও বলা ঠিক হবে না।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানারূপ আলোচনা ও পরামর্শ চলিল। তাহার পর আর এক দফা প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পালা শেষ হইলে, রামবাবু চলিয়া আসিলেন, এবং আচায্যি মহানন্দে নোটগুলি গণিতে বসিলেন।

* * * *

কয়দিন হইতে রামবাবুর শরীরটা ভাল নাই। থাকিয়া থাকিয়া বুক ধড়ফড় করিয়া উঠে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বুক চাপিয়া ধরিয়া শয্যায় শুইয়া পড়েন। আজ সকালে ফটিক ডাক্তারকে ডাকানো হইয়াছিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া গিয়াছেন, 'লংস' খুবই 'উইক', পুষ্টিকর খাদ্য আহারের প্রয়োজন।

দ্বিপ্রহরে সামনে বসিয়া থাকিয়া শিবরাণী রামবাবুকে খাওয়াইতেছিল। মাছের মুড়াটা রামবাবুর খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শিবরাণীর তাগাদায় না-খাইয়া পারিলেন না। তাহার পর দইয়ের বাটিটা চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া, দুইটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করতঃ একটু জল খাইয়া গল্প ভিজাইয়া লইয়া, আর একটি যেই মুখে তুলিতে যাইবেন, অমনি বুক চাপিয়া ধরিয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িলেন! শিবরাণী প্রমাদ গণিয়া পাখা আনিতে ছুটিল, বামুন ঠাকুর এক বাল্‌তি জল আনিয়া ফেলিল, কেষ্টা চাকর ফটিক ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল।

ফটিক ডাক্তার আসিয়া বুকে-পিঠে 'ষ্টেথেসকোপ' বসাইয়া, নাড়ী দেখিয়া, জিভ পরীক্ষা করিয়া, চোখের কোল টানিয়া, নানাভাবে পরীক্ষা করিবার পর মুখখানাকে একটু চিন্তা-বিকৃত করিয়া কহিল, "এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলুম যে হবে। 'ফঞ্জিটোলিয়া অফ্ হার্ট'—এ বড় শক্ত রোগ!"

শিবরাণীর মাথা ঘুরিয়া গেল, চক্ষে সে জগৎ অন্ধকার দেখিল।

রামবাবুকে ধরা-ধরি করিয়া শয্যায় আনিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কখনো স-চেতন, কখনো অ-চেতন। চক্ষু অধিকাংশ সময়ই মুদ্রিত। বাক্য একেবারেই বন্ধ; মুখে শুধু মধ্যে মধ্যে গোঁ-গোঁ শব্দ!

একটা জরুরী ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া ফটিক ডাক্তার কেষ্টাকে ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দিল, খানিকটা গরম জল আনিতে বামুনঠাকুরকে নীচে পাঠাইল, শিবরাণীকে কহিল, "আপনি দুটি মৌরী ভিজিয়ে ছটাক-খানেক জল নিয়ে আসুন ত।"

শিবরাণী চলিয়া গেলে রামবাবু ফিস্-ফিস্ করিয়া ফটিক ডাক্তারের উদ্দেশে কহিলেন—"বাজে ওষুধ-ফষুদ খাইয়ে যেন প্রাণবধ ক'রো না, ডাক্তার; দেখো বাবা!"

তেমনি ফিস্-ফিস্ করিয়া ফটিক ডাক্তার কহিল, "কোন ভাবনা নেই। কিন্তু অনেক মিথ্যা কথা আর পরিশ্রম, 'ফি' আর কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে, রামবাবু! আপনি হচ্ছেন রাজা লোক; এ রকম একটা ব্যাপারে—"

"আচ্ছা, আরও একশো দোবো। তার পর, এ-বাড়ীতে যখন পাঁচটা ছেলেপুলের আমদানী হবে, তখন ত তোমার আয় বেড়ে যাবে হে ডাক্তার; কিন্তু, দেখো যেন—"

সিঁড়ীতে পদশব্দ শুনিয়া উভয়কেই তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাক হইতে হইল।

ফটিক ডাক্তার বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। আহারের যেন কোন বৈলক্ষণ্য না হয়; ভাত, রুটী, লুচি, দুধ, ফল ইত্যাদি। রোগীর আহারে অরুচি নাই। আধ-সচেতন আধ-অচেতন অবস্থায় সকল পথ্যই সুন্দরভাবে উদরস্থ করিতেছেন। তবে বাক্য পূর্ব্ববৎই বন্ধ, এবং বুক চাপিয়া গোঙানী শব্দ—তাহার আর বিরাম নাই।

দুশ্চিন্তায় শিবরাণীর মনের অবস্থা শোচনীয়। বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও ফটিক ডাক্তার বলিয়াছে—"রোগ খুবই শক্ত, তবে কোন ভয় নেই।" এই আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া শিবরাণী যত দেব-দেবীর কাছে মানত মানিল।

রাতটা একরকমে কাটিল। কিন্তু পরদিন রোগ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। শিবরাণী বুঝিতে পারিল, ফটিক ডাক্তারের স্তোকবাক্য—ভুয়া। শিবরাণী ঠাকুর-দেবতাদের পায়ে প্রার্থনা জানাইয়া গোবিন্দ আচায্যিকে ডাকাইয়া আনিল। গোবিন্দ আসিয়া, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, —"কালকেই আমাকে খবর দাওনি কেন মা? যাই হোক, কোন ভয় নেই, আমি দেখচি।" গোবিন্দ পাঁজি-পুঁথি, কাগজ-কলম প্রভৃতি লইয়া গণনায় বসিলেন। রামবাবুর রাশি-লগ্নের ছক আঁকিয়া নানারূপ হিসাব করিয়া কহিলেন,—"ইস্! মঙ্গল একেবারে পঞ্চমে! তার ওপর, রাহুর বিশ অংশে অবস্থান ও দৃষ্টি! যা'ক, এখনি এর প্রতিকার করে ফেলচি।"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া নানারূপ জপ-তপ ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গোবিন্দ কহিলেন, "রাশিকে জাগ্রত করিয়ে, রাহুকেই ভর করাতে হবে। রোগীর ওপর ভর কোরে গ্রহই প্রতিবিধানের পথ বোলে দেবে।"

রামবাবুর ছিল ধনুরাশি। গোবিন্দ একটি ঝাটার কাঠি বাঁকাইয়া তাহার দুই প্রান্তে সূতা বাঁধিয়া ধনুকের মত করিলেন, এবং তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনুকের সূতা 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। গোবিন্দের মুখে হাসি ফুটিল ; কহিলেন,—"ব্যস্! রাশি যখন জাগ্রত হোয়েচে, আর কোন ভয় নেই। এইবার মা-লক্ষ্মী, তুমি ওর শিওরে বোসে মাথায় হাতখানা ছুঁইয়ে রাখো, দণ্ডাধিপতি রাহুই এবার রোগীর মুখ দিয়ে ওর রক্ষার উপায় বোলে দেবেন।"

গোবিন্দের মন্ত্রপাঠ, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান সমানে চলিতে লাগিল। ওদিকে রোগীর গোঁয়ানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। শিবরাণী ভীত সন্ত্রস্ত মনে স্বামীর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে গোবিন্দ উচ্চস্বরে 'ওঁ স্বাহা' বলিয়া কিছু ধূনা ধুনুচিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র রোগীর গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং রোগী অতি ধীরে, অতি স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—'আকর্ষণ! বিকর্ষণে মৃত্যু! রাম-রেখা-বিবাহ-মিলনে জীবন। ব্যাঘ্র-হট্টে, নিরাকার পঞ্চমে সা কন্যা।'

শিবরাণী কিছুই বুঝিতে পারিল না ; একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে গোবিন্দের মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোবিন্দ বলিলেন, "আর ভয়ের কোনই কারণ নেই। এইবার বাবাজীর মহা-রিষ্টি কেটে গেল। এখন স্বয়ং দণ্ডাধিপতির নির্দ্দেশ মত কাজ করতে হবে। ভালই হোল, তোমার এ সংসারে মা-লক্ষ্মী, আর কোন আপদ-বিপদ সহসা ঘটবে না।"

"ব্যাঘ্র-হট্ট কাকে বলে বাবা ?"

"সবই বুঝতে পারা যাবে। রোগী আরও কিছু বল্‌বে; ঠোঁট কাঁপচে।"

রোগীর মুখ হইতে আরও অনেক কথা বাহির হইল। তাহার পর রোগী স্তব্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং দুই দিনের পর এইবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন গোবিন্দ আচায্যি শিবরাণীকে—'ব্যাঘ্র-হট্ট' এবং 'রাম-রেখা' সম্পর্কে নির্দ্দেশের যে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে হট্ট অর্থাৎ হাট ও বাজার শব্দ অভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়, আচার্য্য শিবরাণীকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন।

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

রামবাবু কহিলেন—"যত সব আজগুবি কাণ্ড! ও সব আমার দ্বারা হ'বে-ট'বে না।"

শিবরাণী কহিল, "তোমার যে কি ব্যাপার হোয়েছিল, তা ত আর কিছু জ্ঞান নেই! নারায়ণের দয়াতে তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি। এতে আর অমত কোরো না।"

"যত সব অনাছিষ্টি ব্যাপার। ঐ আচায্যি মশায়ের সব চালাকী। বোধ হয়, ঘুস্-টুস্ খেয়ে কাদের ঐ মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপাবার মৎলব। ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমার এই জীবনের তুমিই একমাত্র সঙ্গিনী, আমি আর কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে পারব না।"

"আনতেই হবে; এ যে দৈবের ব্যাপার। তোমার-আমার মঙ্গলের

রামবাবুর ছিল ধনুরাশি। গোবিন্দ একটি ঝাটার কাঠি বাঁকাইয়া তাহার দুই প্রান্তে সূতা বাঁধিয়া ধনুকের মত করিলেন, এবং তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনুকের সূতা 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। গোবিন্দের মুখে হাসি ফুটিল ; কহিলেন,—"ব্যস্! রাশি যখন জাগ্রত হোয়েচে, আর কোন ভয় নেই। এইবার মা-লক্ষ্মী, তুমি ওর শিওরে বোসে মাথায় হাতখানা ছুঁইয়ে রাখো, দণ্ডাধিপতি রাহুই এবার রোগীর মুখ দিয়ে ওর রক্ষার উপায় বোলে দেবেন।"

গোবিন্দের মন্ত্রপাঠ, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান সমানে চলিতে লাগিল। ওদিকে রোগীর গোঁয়ানী পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল। রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য। শিবরাণী ভীত সন্ত্রস্ত মনে স্বামীর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে গোবিন্দ উচ্চস্বরে 'ওঁ স্বাহা' বলিয়া কিছু ধূনা ধূনুচিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র রোগীর গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং রোগী অতি ধীরে, অতি স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—'আকর্ষণ! বিকর্ষণে মৃত্যু! রাম-রেখা-বিবাহ-মিলনে জীবন। ব্যাঘ্র-হট্রে, নিরাকার পঞ্চমে সা কন্যা।'

শিবরাণী কিছুই বুঝিতে পারিল না ; একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে গোবিন্দের মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোবিন্দ বলিলেন, "আর ভয়ের কোনই কারণ নেই। এইবার বাবাজীর মহা-রিষ্টি কেটে গেল। এখন স্বয়ং দণ্ডাধিপতির নির্দ্দেশ মত কাজ করতে হবে। ভালই হোল, তোমার এ সংসারে মা-লক্ষ্মী, আর কোন আপদ-বিপদ সহসা ঘটবে না।"

"ব্যাঘ্র-হট্র কাকে বলে বাবা ?"

"সবই বুঝতে পারা যাবে। রোগী আরও কিছু বল্‌বে; ঠোঁট কাঁপচে।"

রোগীর মুখ হইতে আরও অনেক কথা বাহির হইল। তাহার পর রোগী স্তব্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার গোঁয়ানী বন্ধ হইয়া গেল, এবং দুই দিনের পর এইবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন গোবিন্দ আচায্যি শিবরাণীকে—'ব্যাঘ্র-হট্ট' এবং 'রাম-রেখা' সম্পর্কে নির্দ্দেশের যে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে হট্ট অর্থাৎ হাট ও বাজার শব্দ অভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়, আচার্য্য শিবরাণীকে ইহা বুঝাইয়া দিলেন।

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

রামবাবু কহিলেন—"যত সব আজগুবি কাণ্ড! ও সব আমার দ্বারা হ'বে-ট'বে না।"

শিবরাণী কহিল, "তোমার যে কি ব্যাপার হোয়েছিল, তা ত আর কিছু জ্ঞান নেই! নারায়ণের দয়াতে তোমাকে আবার ফিরে পেয়েছি। এতে আর অমত কোরো না।"

"যত সব অনাছিষ্টি ব্যাপার। ঐ আচায্যি মশায়ের সব চালাকী। বোধ হয়, ঘুস্-টুস্ খেয়ে কাদের ঐ মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপাবার মৎলব। ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমার এই জীবনের তুমিই একমাত্র সঙ্গিনী, আমি আর কাউকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে পারব না।"

"আনতেই হবে; এ যে দৈবের ব্যাপার। তোমার-আমার মঙ্গলের

জন্যে, সংসারের মঙ্গলের জন্যে, এ কাজ তোমায় করতেই হবে। এতে আর অমত করা চলবে না।"

এই সময়ে গোবিন্দ আচায্যি আসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—"নিরাকার ষ্ট্রীটের পাঁচ নম্বর বাড়ীতে গিয়ে ব্যবস্থা সব ঠিক করে এলুম মা-লক্ষ্মী। দৈবের যোগাযোগ কি না, কিছু বলতে হোল না—। যেন বহুপূর্ব্ব থেকেই সব ঠিক হোয়েছিল, কথা পাড়বামাত্রই সব ঠিক হোয়ে গেল। বৈকালে মেয়ের বাবা এসে বাবাজীকে দেখে যাবেন।"

শিবরাণী কহিল, "সব ভার আপনার ওপর বাবা। এ ব্যাপারে মাথার ওপর আর আমাদের কেউ অভিভাবক নেই। সবই যখন ক'রলেন, শেষ পর্য্যন্ত থেকে কাজটি শেষ ক'রে দিতে হবে।"

রামবাবু বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি বিয়ে করলে ত উনি কাজ শেষ করবেন। আর একটা বিয়ে আমি কিছুতেই করব না; তার চেয়ে—"

বাকী কথা মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই রামবাবুর সর্ব্বাঙ্গ হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। তখনি গোবিন্দ আচার্য্য রামবাবুর মস্তকোপরি হাত রাখিয়া রাহুর স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। প্রায় মিনিট দুই তিন পরে রামবাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইহার পর আর তিনি অমত করিতে সাহস করিলেন না।

কিন্তু একটু গোল বাধাইয়াছিলেন—১০ই জ্যৈষ্ঠ, বিবাহ-তারিখের —সন্ধ্যায়, বর-বেশে গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বক্ষণে।

চন্দন-চর্চ্চিত দেহ, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য, পরিধানে বেনারসী জোড়, পশ্চাতে নাপিত সুদৃশ্য টোপর হস্তে দণ্ডায়মান, বহির্দ্বারে রাস্তার উপর পত্রপুষ্পে-সজ্জিত মোটর-কার তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—এমন সময় হঠাৎ

তিনি বাঁকিয়া বসিলেন। শিবরাণীর মুখের দিকে চহিয়া কহিলেন—"আমি যাব না।" শিবরাণী কহিল—"দেখ, শুভদিনে অনাছিষ্টি কথা বলো না ; ও-রকম করলে ঠিকই আমি আফিং খেয়ে মরবো তা ব'লে রাখ্‌চি।"

আর কোন কথা রামবাবু বলিতে সাহস করিলেন না। অগ্রসর হইয়া হুলুধ্বনির মধ্যে মোটরে উঠিয়া বসিলেন।

অন্তরে তাঁহার আনন্দের ঝড় বহিলেও, যেন জ্যৈষ্ঠ-সন্ধ্যার নির্ব্বাত গুমট তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

মোটর চলিতে সুরু করিলে মনে মনে তিনি কহিলেন,—"যা'ক, কার্য্যসিদ্ধি !—আজ আমার কেল্লা-ফতে !"

ভবানী রায়ের গল্প-লেখা

'রূপালী' কাগজের 'বড়দিন' সংখ্যার জন্য একটি গল্প লিখিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে যতই তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে, গল্পের প্লট্ ভাবিতে ভাবিতে ততই দিনের পর দিন বৃথাই কাটিয়া যাইতেছে। হয় ত কাগজ বাহির হইতে আর দিন পনর মাত্র মধ্যে আছে। সুতরাং কি করিয়া যে কি হইবে—চিন্তায় পড়িলাম। একটা সত্যঘটনামূলক 'প্লট' মনে পড়িল। এক ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলে। স্ত্রী-বিয়োগের পর ভদ্রলোকটি ছেলেটিকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি পড়াশুনায় খুব ভাল হইল। এন্ট্রান্স, এফ. এ., বি. এ., এম. এ.—বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টা পরীক্ষাতেই খুব ভাল ভাবে পাশ করিল। ছেলের বিয়ের জন্য একটি সুশ্রী ও সুলক্ষণা পাত্রী দেখা হইল। ছেলেটির কিন্তু ইচ্ছা নয় যে, সে বিয়ে করে। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাপ সেই মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহ দিল। বিবাহ-বাসরেই ছেলেটির হইল জ্বর এবং ফুলশয্যার রাত্রে সেই জ্বর প্রবল হইয়া ছেলেটি গেল মারা। বাপ পাগলের মত হইয়া গেল। ছেলের চিতাগ্নির সামনে দাঁড়াইয়া তাহার ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট চারখানা একটির পর একটি করিয়া আহুতি দিতে দিতে বলিতে লাগিল,—" !"—কি যে বলিয়াছিল, ঠিক আমার মনে নাই। মনে না থাকিলেও ক্ষতি নাই। গোটাকতক বুক-ফাটা খেদের কথা বাপের মুখ দিয়া বাহির করিলেই চলিবে। কিন্তু গল্পটা হইবে ট্রাজিডি। 'বড়দিনে'র আনন্দ-অবসরে ট্রাজিডি ত চলিবে

না। হাসির কিছু চাই। সুতরাং ভয়ানক ভাবে কোন-একটা হাসির প্লট্ মনে মনে দিনরাত ভাবিতে লাগিলাম।

অবশেষে পাইয়া গেলাম। ছোট্ট একটা হাসির কাহিনী মনের পাতায় ছকিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই কাগজ-কলম লইয়া লিখিতে লাগিলাম ঃ—

'পৌষ মাস। 'বড়দিন' আসন্ন। আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। তাহার স্বচ্ছ তরল রজত-শুভ্র হাসিতে আকাশ এবং পৃথিবী উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে। চৌধুরী বাড়ীর গিন্নী দোতালার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর শোভা দেখিতেছিলেন। এ-হেন সময় কর্ত্তা নটবর চৌধুরী তাঁহার স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মন লইয়া ধীরে ধীরে তথায় আসিলেন এবং অধীর-আনন্দে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে, কতকটা সুরে, কতকটা বে-সুরে, চাপা-গলায় গাহিয়া উঠিলেন—

"মরিব—মরিব সখী,
আমি নিশ্চয়ই মরিবো—ও-ও-ও।"

চৌধুরী-গৃহিণী সহসা স্বামীর এই———'

"বাবু!"

লেখা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম—হীরু গয়লা। সমস্ত মনটা অসন্তোষ এবং নিরানন্দে ভরিয়া গেল। হীরুকে যে সশরীরে হঠাৎ এই ভাবে দেখিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। হীরুর সাবেক্ দুধের দাম ৩১৮/১৫—ভাবিয়াছিলাম, ভগবান আমাকে এ-যাত্রা রেহাই দিলেন। কারণ, সংবাদ লইয়াছিলাম এবং বরাবরই সংবাদ লইয়া আসিতেছি যে, হীরুর এ-যাত্রা আর রক্ষা নাই, ভব-সংসারের দেনা-পাওনা যেমন আছে তেমনই রাখিয়া তাহাকে পারের নৌকায় উঠিতেই হইবে। সাংসারিক

এই অসচ্ছলতার সময় মনে বেশ একটু তৃপ্তি পাইয়াছিলাম। কিন্তু—এ যেন 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' পড়িল। এই পাঁচ-সাতটা দিন, শুধু হীরুর খবরটা লইতে পারি নাই। এই ক'দিনের ভিতরেই যে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাইবে, এ আশা করি নাই। ম্লান মুখে কহিলাম—"কেমন আছ হীরু?" হীরুর স্পর্দ্ধার সীমা নাই; সৌজন্যের হাসি হাসিতে হাসিতে কহিল—"আপনার আশীর্ব্বাদে এ-যাত্রা———"

তাহার বাকী কথা কর্ণের দুয়ার হইতে ফিরাইয়া দিলাম। কি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিয়া গেল, আমি সেদিকে মনই দিলাম না। না দিলেও তাহার স-বিনয় শেষ কথাটা কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল—"অনেক দিনের বাকী পাওনা; এ সময়টায় পেলে পুনর্জ্জীবন পাওয়ার মতোই হবে। গরীবের প্রিতি একটু অবধারিত হবেন।"

মুখটা ফিরাইয়া লইলাম। সে চলিয়া গেল। গল্প লেখার দফা রফা হইয়া গেল। ভারাক্রান্ত অন্তরে হাসির গল্প লেখা চলে না।

পরদিন প্রাতঃকালে খোলা জানালার বাহিরে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিলাম।—গল্পের প্লট ভাবিবার ফলে যে এই উদাস এবং আকাশ-দৃষ্টি, তাহা নয়, পয়সা-কড়ির অভাবই মনকে একদিকে ভারি করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে দৃষ্টিকে হাল্কা করিয়া আকাশমার্গে পাঠাইয়াছিল। এমন সময়ে হীরু সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরক্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই সে বিনীতভাবে কহিল—"সাবেক পাওনাটার সম্বন্ধে আজ একটু ক্রেপা করবেন কি? এ সময়ে ওটা পেলে চিরকাল আপনার চরণে কেতম্ব হয়ে থাকবো।"

হীরুর কৃতঘ্নতায় সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিল। তাহাকে পাঁচ সাত দিনের কড়ার দিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম।

'উই আর সেভেন্'

কিছু পরে পিয়ন দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। একখানি 'রূপালী' কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। কাগজ বাহির হইতে আর মাত্র ৮।১০ দিন দেরী, তাই সবিনয়ে কড়া তাগাদা। দুঃখ এবং নৈরাশ্যের সহিত চিঠিখানা এক ধারে ফেলিয়া রাখিলাম। মনের অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া মনের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইল—"হায় রে! কান্নায় যেখানে বুক ভরে আছে, সেখানে হাসির ফোয়ারা তুলে, হাসির গল্প লিখবো!"

অপর চিঠিখানা খুলিলাম। পড়িয়া আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। মৃত্যু সংবাদ!

পিসিমার মৃত্যু সংবাদ। 'ষ্টার ডেথ্ বেনিফিট্ ইনসিওরেন্স কোং'তে বুড়ীর লাইফ ইনসিওর করিয়াছিলাম। আজ তিন বৎসর সমানে মাসে মাসে একটা করে টাকা প্রিমিয়ম দিয়া আসিতেছি। তিন বৎসর আগে যখন বুড়ীর নামে ইনসিওর করি, তখন আমি এবং আমার সঙ্গে আর সকলেই ধ্রুব বিশ্বাস করিয়াছিল যে, বুড়ীর জীবনের ওয়াদা বড় জোর আর মাস পাঁচ ছয়। কিন্তু সেই বিশ্বাস এবং আশাকে বুড়ী তার দুর্ব্বল হাতে সবলে ঠেলিয়া দিয়া, দপ্-দপানীর সহিত এই সুদীর্ঘ ৩৬ মাস মাড়ীর সাহায্যে লুচি, পরেটা প্রভৃতি এবং হামানদিস্তার সাহায্যে গুয়া পান, দোক্তা প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া আমাকে জীবন্তে মৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে……।

যা'ক, বাঁচা গেল। কম পক্ষে শ' তিনেক টাকা যে পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অন্তরের সমস্ত নিরানন্দ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাহার স্থানে আনন্দের বন্যা ছুটিল। 'রূপালী'র সেই গল্পের কাগজখানা লইয়া লিখিতে সুরু করিলাম—

'চৌধুরী-গৃহিনী সহসা স্বামীর এই উৎকট এবং উদ্ভট রসোক্তি শুনিয়া যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা আর না বলিয়া, মুখ এবং চক্ষু কোঁচকাইয়া সম্মুখস্থ শয়ন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জালিবোটের মত নটবর চৌধুরীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গিয়া হাজির হইলেন এবং পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী এবং সুর-ভঙ্গীর সহিত গা হিলেন—

'যদি ভালবাসো তুমি,—যদি ভালবাসি আমি,
তবে মরে ভুত হ'ব—হোয়ে তব সঙ্গে
রবো—ও—ও—ও—ও !'

—"এই যে ! নমস্কার !"

মুখ তুলিয়া দেখি, জানবাজারের জীবন বাবু। বাধ্য হইয়া লেখাটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিলাম—"আসুন। খবর সব ভাল ত' ?"

জীবনবাবু আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"রজতের কোন খবর রাখেন ? রজত কোথায় ?"

রজত আমার ছেলে। কহিলাম—"দিন আষ্টেক হোল সে তার মামার বাড়ী গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। কেন বলুন ত ?"

জীবনবাবু সেইদিনকার একখানা দৈনিক খবরের কাগজের একটা অংশ দেখাইয়া দিয়া আমায় পড়িতে বলিলেন। মনে মনে পড়িলাম :—

'বালীগঞ্জের শ্রীযুক্ত রজত রায় ও বিখ্যাত ফিল্ম-অভিনেত্রী শ্রীমতী মদিরা কর্ম্মকার গত শনিবারের শুভ-সন্ধ্যায় পরস্পরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিবাহের পর নব-দম্পতী মধুযামিনী যাপন মানসে রাঁচি যাত্রা করিয়াছেন। এই সংস্কারমুক্ত, সাহসী এবং স্বাধীন প্রেমিক-যুগলকে আমরা সাদরে আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।'

কতকটা স-জ্ঞানে এবং কতকটা অ-জ্ঞানে সংবাদটা পড়িবার পর, মাথার উপর আকাশের মত বৃহৎ একটা বস্তুর ভার বোধ করিলাম। কাগজখানা ইতিপূর্ব্বেই হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে মাথাটা ঘুরিতে এবং সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। শুইয়া পড়িতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে পারিলাম না, কোন প্রকারে দেহটাকে খাড়া রাখিলাম।

জীবনবাবু কহিলেন—"রজতের সম্বন্ধ কোথায় না পাকা-পাকি কোরে ফেলেছিলেন ?"

একটা টানা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—"হ্যাঁ।"

"কত টাকা নগদ দেবে বলেছিল তারা ?"

"সতের শ' এক ; আর হাজার টাকার গয়না। উঃ! রজত আমায় ফাঁসিয়ে গেল জীবনবাবু! বাড়ীখানা বাঁধা আছে হাজার টাকায়। ভেবেছিলুম—উঃ! অকুল পাথারে পড়লুম !" রূপালীর গল্পের কাগজখানা সামনে হইতে ছুঁড়িয়া একধারে ফেলিয়া দিলাম।

দিন দুই চারি কি ভাবে কোথা দিয়া কাটিল, তাহার কোনোও খেয়ালই আমার রহিল না। ঘর হইতে বড় একটা আর বাহির হইতাম না, আর অপর কেহও আমার সামনে আসিত না। তবে বহিশ্চক্ষুতে হীরু গোয়ালাকে দুই বেলাই একবার করিয়া করজোড়ে সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিতাম, আর মনশ্চক্ষুতে—একবার দেখিতাম রজতকে আর সেই না-দেখা মদিরা কর্ম্মকারকে, আর একবার দেখিতাম, ১৭০১ টাকা দিবার প্রস্তাবকারী চন্দননগরের সেই ভদ্রলোকটিকে।

দীর্ঘ ৪৫ বৎসরেও যে ডিস্পেপ্সিয়া রোগ দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই, মনে হইল, এই তিন চার দিনেই যেন আমাকে তাহা আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা খাই, ভাল হজম হয় না ; পেট ভুট্-ভাট্ করে ;

ক্ষুধা ত নাই-ই ; নিদ্রাও নাই। অথচ বসিয়া থাকিতেও পারি না। সর্ব্বদা শুইয়া থাকি। শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ ছট্-ফট্ করি।

সেদিন সকালে এইরকম শুইয়া ছট্-ফট্ করিতেছি, শুনিলাম—বাহিরে কে-একজন লোক আসিয়া নন্দ চাকর-ছেলেটার সঙ্গে কি বকাবকি জুড়িয়া দিয়াছে। মিনিট দুই পরে নন্দা আমার ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"কে একজন বাবু আপনাকে ডাকতিছে।"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিলাম—"বল গিয়ে যে বাবুর অসুখ করেছে।"

খানিক পরে নন্দা আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"বাবু কইলেন, জরুরী কি দরকার, আপনাকে যা'তিই.হবে।"

খুব বিরক্ত হইয়া এবং মনে মনে লোকটাকে গালি দিতে দিতে বৈঠকখানায় আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই বাবুটি কহিলেন—"শুনলুম আপনার অসুখ করেচে। তবুও আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম, মাফ কর্বেন। কিন্তু অসুখ আপনার সেরে যাবে, আপনার. নামই ত ভবানী রায় ?"

বিরক্তিতে আমার অন্তরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল ; কহিলাম—"হ্যাঁ। আপনি আসচেন কোথা থেকে ? রাঁচি থেকে কি ?"

"আজ্ঞে না, আমার বাড়ী বাগবাজার। আমি একজন এটর্ণী। নিবারণ ঘোষাল আপনার কে হ'ন বা হ'তেন ?"

"আমার ছোট মামা। 'হ'তেন' বলছেন কেন ?"

"তিনি মারা গিয়েছেন।"

"মারা——"

"হ্যাঁ, মারা গিয়েছেন।"

"আমার অন্ত মামাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে তিনি আজ ১০৷১২ বছর হোল একেবারে নিরুদ্দেশ——"

"হ্যাঁ; তিনি বর্ম্মায় ছিলেন। এবং সেখানে কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা করে এই কয় বছরে ২১ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে গেছেন। আর সেই সব টাকাটা তিনি উইল করে আপনাকে দান করে গেছেন। সুতরাং——"

"একুশ হাজার! ছোট মামা? আমাকে!——" আমার ঘূর্ণায়মান মাথা আরও ঘুরিয়া উঠিল। সেই অবস্থায় তিনি ছোটমামার উইলের নকল পকেট হইতে বাহির করিয়া আমাকে পড়িয়া শোনাইলেন।

তাহার পর কি ঘটিল তাহা আমি বলিতে পারিব না এবং বলা বাহুল্য বলিয়াও মনে করি। এটর্ণীবাবু সেইদিনই অতি অবশ্য তাঁহার আফিসে যাইতে বলিয়া গেলেন।

এটর্ণীবাবুর আফিস হইতে সন্ধ্যার পর যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন মনের অবস্থা সুস্থ নহে। এ অসুস্থতা অবশ্য আনন্দের অতিশয্যবশতঃ। কোন কাজে কর্ম্মে কিছুতেই মন বসাইতে পারিলাম না। মন যেন হাল্কা পালকে পরিণত হইয়া শূন্যে শূন্যে উড়িতে লাগিল। দেহের অবস্থাও মনের অনুরূপ। ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই; এ যেন উল্টা একরকমের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।

এই অবস্থাতে কিন্তু মনে পড়িয়া গেল—'রূপালী'র কথাটা। 'রূপালী'র গল্পটা যে দিতেই হইবে। সেই ছুঁড়িয়া-ফেলিয়া-দেওয়া গল্পের কাগজখানা খুঁজিয়া বাহির করিলাম। কলম লইলাম। কিন্তু একটা লাইনও লিখিতে পারিলাম না। মন চঞ্চলভাবে নানা বিষয়ে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর কাগজখানাকে ছুঁড়িয়া

না দিলেও, ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে বলিলাম, নটবরের যখন অত মরিবার সখ, তখন মরুক। নটবর যেন মরিল, কিন্তু 'রূপালী'র সম্পাদককে একখানা পত্র দেওয়া দরকার। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে লিখিলাম—

————'মাফ করিবেন। গল্প লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। না-পারার প্রথম দিককার কারণ—হীরু গোয়ালা এবং রজতনাথ; শেষের দিককার কারণ—ছোটমামা এবং তস্য নগদ একুশ হাজার টাকা। নমস্কার।

শ্রীভবানী রায়।'

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

১

বেলা আট ঘটিকার সময়, কিছু জলযোগান্তে শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার হুঁকাটি হস্তে লইয়া বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বিশেষ কোন চিন্তার ছায়া যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকটিত। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, এবং একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবার পর তিনি ধীরে ধীরে সম্মুখের বাড়ীটার পথের উপরকার রোয়াকে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এই বাড়ীটি কয়েক মাস শূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। গতকল্য হইতে একঘর ভাড়াটিয়া আসিয়াছে। ছোট বাড়ী। যাঁহারা ভাড়া লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের পরিজন-সংখ্যাও ছোট—অর্থাৎ মাত্র দুইটি প্রাণী; স্বামী এবং স্ত্রী।

ছোট বাড়ীর ছোট পরিজনের মধ্যে কিন্তু বড় রকমের একটা কাজ-কর্ম্মের সাড়া আজ সকাল হইতেই পড়িয়া গিয়াছিল। জল-তোলা, ঝাঁট-পাট, বাসন-কোসন মাজা-ধোওয়া, রান্না-ভাঁড়ার গোছানো—প্রভৃতি কাজে প্রত্যূষ হইতে বাড়ীর গিন্নী গলদ্‌ঘর্ম্ম। তবু, কাজে তাঁহার বিরক্তি নাই—পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই। একখানি গামছা পরিধান করিয়া ও আর একখানি গামছা বুকে জড়াইয়া তিনি একই জায়গায় পাঁচ বার ঝাঁট দিতেছেন, একই বাসন দশবার ধুইতেছেন। সমস্ত উঠান ও রোয়াকে কতবার যে গোবরজল ছড়া দিয়াছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই। গোবরজলের পর গঙ্গাজলের

'ফিনিশিং টাচ্' (Finishing touch) দিয়াও তাঁহার মনের খুঁত-খুঁতানি যায় নাই।

রজনী বাবু অর্থাৎ শ্রীমতীর যিনি শ্রীমৎ—অর্থাৎ এই গৃহের যিনি কর্ত্তা, তিনি আজ কয়েক দিন হইতে একটা নূতন বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। দালানের এক প্রান্তে একখানি সতরঞ্চির উপর বসিয়া তিনি তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তায় বিভোর। মাঝে মাঝে গৃহিণীর কাজ-কর্ম্ম-জনিত-সাড়া-শব্দে তাঁহার সেই চিন্তায় একটু-আধটু ব্যাঘাত পড়িলেও চিন্তা-সূত্র তাঁহার একেবারে ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু এইবার হইল। গৃহিণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গে তখনো সেই গামছার বেশ। প্রভেদের মধ্যে—কিছু পূর্ব্বে তাহা ছিল শুষ্ক, এক্ষণে ভিজা, জল ঝরিতেছে; অর্থাৎ কুসুমকুমারী এক প্রস্থ কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, প্রথম দফা স্নানের পর দালানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম দফা বলা হইল এইজন্য যে, দিবসের মধ্যে কম পক্ষে পাঁচ সাত দফা স্নান তাহাকে করিতে হয়, নচেৎ—অশুদ্ধ জীব-জগতের ছোঁয়াচ্-লাগা তাহার দেহ-মনের বিশুদ্ধতা প্রাপ্তি হয় না।

কুসুম স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, একবার ওঠো দেখি, সতরঞ্চিখানা কেচে দি, আর এইখানটায় একটু গঙ্গাজলের হাত বুলিয়ে নি।

রজনী বাবুর কাণে বোধ হয় কথাটা প্রবেশ করিল না, যে হেতু, মূল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, তিনিই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা—ভোলা স্যাকরার গলায় তুলসীর মালা আছে?

আছে।

হাতে তার 'কুঁড়ো-জালি' থাকে, না?

থাকে। কিন্তু, ওঠো না একবার; সতরঞ্চিখানা কেচে দি। দিয়ে, এইখানটা ধুয়ে দি; তার পর সারাদিন ধরে বসে বসে তুমি ভাব আর লেখ। উনুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। ভাতটা একবার চড়াতে পাল্লে বাঁচি। ওঠো—ওঠো।

অগত্যা খাতা-পত্র লইয়া রজনী বাবুকে উঠিতে হইল এবং অপরাধীর মত বাহিরের রোয়াকের একটি ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু যে গভীর গবেষণা-কার্য্যে তিনি রত ছিলেন, মনের ভিতর হইতে তাহার প্রচণ্ড তাড়া এবং ঠেলা-ঠেলিতে বেশীক্ষণ তিনি আর নিষ্কর্ম্মার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই রোয়াকের উপরই একধারে বসিয়া পড়িয়া গবেষণা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর, যখন পাশের বাড়ীর মুস্তফীদের কাঁটাল-গাছের ফাঁক দিয়া বৈশাখের সূর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কর-স্পর্শ দিতে সুরু করিল, তখন তাঁহার কার্য্যে একটু-আধটু ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাঘাতটা ষোল আনা ছাপাইয়া বত্রিশ আনায় পৌঁছাইল তখন, যখন রান্নাঘর হইতে গৃহিণীর সচকিত এবং ভীত কণ্ঠের চীৎকার সারাবাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হইল—'ও রে, কে রে! কি সর্ব্বোনাশ!'

এই ভয়চকিত ভীষণ চীৎকারে যদিও আকাশ ফাটে নাই বটে, কিন্তু —শুধুই এ বাড়ী নয়—আশ-পাশের বাড়ীগুলি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। রজনী বাবু অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রান্নাঘরে ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, গৃহিণী কুসুমকুমারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া একধারে দণ্ডায়মানা এবং তাহারই তিন হস্ত দূরে দণ্ডায়মান—হুঁকা হস্তে শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

শুধুই রজনী বাবু আসেন নাই; ছুটিয়া আসিয়াছিলেন পূবের বাড়ীর শিবু মুস্তফী, দক্ষিণের বাড়ীর শশধর, পশ্চিমের বাড়ীর বিলাস মুকুজ্যে

এবং উত্তরের বাড়ীর—জয়গোবিন্দ ডাক্তার। এ ছাড়া আসিতেছিলেন—কানাইয়ের মা, হরুর পিসী, নীলুর দিদিমা, কালীর বউদি, মতিলালের বৌ প্রভৃতি; কিন্তু তাঁহারা দূর হইতে নূতন ভাড়াটিয়াদের সদর দরজার সম্মুখে ইঁহাদের চারি জনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

রাস্তার উপর নূতন ভাড়াটিয়াদের দরজার সম্মুখে যাহাদের দেখিয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে তখন নিম্নরূপ আলোচনা সুরু হইল।—

ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

চোর-টোর ঢুকে বোধ হয়—

হঃ! দিনের বেলায় চোর আসবে চুরি করতে!

ছাত থেকে কেউ কি পড়ে-টড়ে গেল ?

বোধ হয়—তোমার গিয়ে……, কারুর কোন অসুখ-টসুখ ছিল কি ?

চোর না হয়, তবে নিশ্চয়ই কোন—

বিকট চীৎকার! নারীকণ্ঠ! ব্যাপারটা সম্ভবতঃ কি হ'তে পারে, হ্যাঁ হে, শশধর ?

হ'তে পারে অনেক কিছুই। বাবুটির নাম কি ? না হয় একবার ডাকাই যা'ক না।

তখন জয়গোবিন্দ ডাক্তার সদর দরজার দিকে আগাইয়া গেলেন।

সকাল বেলায় কুসুমকুমারীর 'কি সব্বোনাশে'র সূত্রে রজনী বাবুর সহিত পাড়ার পাঁচজনের প্রথম দফা যে সংক্ষিপ্ত আলাপ হইয়াছিল, বৈকালে দ্বিতীয় দফায় তাঁহার বাটীর বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সকলের মধ্যে সেই আলাপ গাঢ়তর হইতেছিল।

জয়গোবিন্দ বলিলেন, তা হ'লে আপনার স্ত্রীর একটু 'ইয়ে' বলুন—অর্থাৎ—

রজনী কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ; একটু নয়, ছুঁচিবাইটা বেশ রীতিমতই আছে।

বিলাস মুকুজ্যে হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কিন্তু নীলেটার দেখচি সর্ব্বত্রই গতি। এই চোত মাসের 'রাসে'র মেলায় দু'পয়সা দিয়ে ঐ হুঁকোটা কিনে দিয়েছিলুম; ঘুমোবার সময় ছাড়া ঐটি হাতে নিয়ে ও এ-বাড়ী সে-বাড়ী করতে আর বাকী রাখে না।

শশধর কহিলেন, এ বাড়ীটা এতদিন পড়েছিল কি না। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের এটা ছিল খেলবার আড্ডা।

শিবু মুস্তফী বিলাস মুকুজ্যের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, নাতিটির তোমার পা হ'য়ে অবধি আমার বাড়ীর মাটী ত আর রাখলে না। দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার ত যাবেই। কাল বলছিলুম—'নীলু, তোমার হুঁকোটা আমায় দেবে?'—শুনেই ছুটে পালিয়ে গেল।

সকালের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ইহার পর আর সবিস্তার বিবরণ অনাবশ্যক হইলেও সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে—কুসুম যখন রান্নাঘরে দরজার দিকে

পিছন ফিরিয়া উনানের ধারে বসিয়া ছিল, সেই সময় পশ্চিমের বাড়ীর বিলাস মুকুজ্যের চারি বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র নীলমণি,—ওরফে নীলু—তাহার রাসের মেলায় ক্রীত দুই পয়সা দামের কাঠের রঙীন হুঁকাটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক সদ্য-ধৌত জলচৌকিখানার উপর বসে এবং পার্শ্বে রক্ষিত মাজা বাসনগুলির উপর হুঁকাঘাতের দ্বারা যেমন ঠং করিয়া শব্দ করে, অমনি কুসুম——ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, সেই সমস্ত বাসন-কোসন, জলচৌকী, রান্নাঘরের মেজে, দাওয়া, পৈঠা, মায় সদর দরজার চৌকাঠ পর্য্যন্ত—কুসুমকে আবার ভাল করিয়া ধৌত করিতে হয়। শ্রীমান্ নীলু গণ্ডগোলটি না বাধাইলে হয় ত ইহাদের আহারাদি বেলা একটার মধ্যেই সু-সম্পন্ন হইয়া যাইত, কিন্তু শ্রীমান্‌টির জন্য তাহা ঘণ্টা তিনেক পিছাইয়া যায় এবং সু-সম্পন্নর স্থলে তাহা কোনরূপে সম্পন্ন হয় মাত্র। তারপর বেলা চারিটার সময় আহারাদি শেষ হইলে, বিলাস মুখো, জয়গোবিন্দ, শশধর, শিবু মুস্তফী প্রভৃতির ডাকা-ডাকিতে রজনীবাবু বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সকলের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হয়েন।

আজ রবিবার বলিয়া সকলেরই ছুটী ছিল। শুধু জয়গোবিন্দ ছুটি-ছাটার ধার ধারিতেন না; তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। জয়গোবিন্দ রজনী বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার স্ত্রীর এই রকমটা—অর্থাৎ এই ছুঁচিবাইটা কত দিন থেকে হ'য়েছে?

রজনী বলিলেন, তা প্রায় বিয়ের পর থেকেই ত দেখছি।

ওঁর বয়স এখন কত হবে?

বত্রিশ চৌত্রিশ হবে আর কি।

গায়ের 'কমপ্লেকসান্' কি আপনার মত, না আপনার চেয়ে—

বিলাস মুখো বাধা দিয়া রজনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ইঁনি এক জন ভাল হোমিওপ্যাথ। আপনি যেন অন্য কিছু মনে করবেন না।

অতঃপর জয়গোবিন্দ ও রজনীর মধ্যে আরও দুই চারিটা প্রশ্নোত্তর হইবার পর, জয়গোবিন্দ বলিলেন, 'সিপিয়াতে' সেরে যাবে। ওটা একটা মানসিক ব্যাধি ছাড়া ত কিছুই নয়। আপনি যদি চিকিৎসা করাতে চান, ত বল্‌বেন আমাকে। হ্যাঁ, 'সিপিয়া'তেই ঠিক কাজ হবে।

শশধর জিজ্ঞাসা করিলেন, মশা'য়ের কি করা হয়?

রজনী বলিলেন, অন্য কাজ-কর্ম্ম বিশেষ কিছু করি না, তবে একটু-আধটু 'রিসার্চ' অর্থাৎ গবেষণা—

কোন্ বিষয়ে গবেষণা করেন?

বর্ত্তমানে গবেষণা সুরু করেছি খুব কঠিন একটা বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ আপনারা এমন লোক অনেক দেখতে পাবেন—যারা দুটি বেলা পূজো-আহ্নিক, জপ-তপ করে, গলায় তুলসীর মালা, হয় ত হাতে 'কুড়োজালি'ও আছে; মোটের উপর পরম ধার্ম্মিক—কিন্তু জুচ্চুরিতেও হয় ত পরম পটু। অর্থাৎ—

শিবু মুস্তফী হাসিয়া কহিলেন, অর্থাৎ বক-ধার্ম্মিক আর কি।

রজনী কহিলেন, মোটামুটি তাই বটে। তবে ঠিক তা নয়। এমনটা হয় কেন? প্রত্যেকের মনের একটা বংশ আছে। তার পরিচয়, তার বিশ্লেষণ, তার—। সম্প্রতি ভোলা স্যাকরা বলে একটি লোক আমার স্ত্রীর ছ'ভরির একছড়া হার গড়ে দিয়ে—

বিলাস মুকুজ্যে কথার উপর বলিয়া উঠিলেন, আরে, ও বলছেন কি, এই হাল্-ফিল্ এক জন বড় উকীল—বয়স তার ষাট বছর পার হোয়েছে, রীতিমত ধার্ম্মিক লোক বলেই আমরা জানি, রবিবার রবিবার সব কাজ-কর্ম্ম

ফেলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে গড়া-গড়ি খান, চোখ বুজে কাঁদতে কাঁদতে বলেন—'কামিনী-কাঞ্চন' থেকে অব্যাহতি দাও ঠাকুর—।

তা, তিনি করেছেন কি ?

সে আর আপনাকে কি বলব ; সামান্ত ক'টা—

বাধা দিয়া শশধর রজনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, এর আগে কোন্ কোন্ বিষয়ের গবেষণা আপনি করেছেন ?

করেছি অনেকই। 'হিন্দুস্থান রিসার্চ সোসাইটী' আমার প্রত্যেক গবেষণারই খুব উচ্চ প্রশংসা করেচেন। এই ধরুন গিয়ে—পৃথিবী গোল বটে, কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে যে মোটেই চাপা নয়, সেটা আমি সুন্দর ভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

বলেন কি !

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর একটা জিনিষ। আমাদের বাংলা ভাষা থেকেই যে ইংরেজদের ভাষার সৃষ্টি, এ কথা শুনে আপনারা বোধ হয় চমকে যাবেন, কিন্তু ব্যাপারটা তাই। এই ধরুন—'মানব,' তার থেকে 'ম্যানব,' তার থেকে 'ম্যান' (man) ; 'দ্বার'—চলতি কথায় বলি 'দোর'—তার থেকে 'ডুয়োর' (door) ; 'আঁখি' থেকে 'আঁয়ি,' তার থেকে 'আই' (eye)।—

সোৎসাহে বিলাস মুখো বলিয়া উঠিলেন, ঠিকই ত বটে। এ ত আপনি—সাংঘাতিক একটা—

রজনী প্রসন্নতার মৃদুহাসি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এই রকম রাশী রাশী কথা দেখিয়ে আমি প্রমাণ ক'রে দিয়েছি। এই ধরুন :—'মশা'—অর্থাৎ 'মশকটি'—তার থেকে 'মশকুইটো' (mosquito) ; "ভ্রু" থেকে "ব্রু" তার থেকে "ব্রাও" (Brow) ; "জয়ধ্বনি"র ধ্বনি বাদ দিন—থাকবে' "জয়" (joy) ; "দেওয়াল"এর দে বাদ দিন, কি থাকবে ? 'ওয়াল' (wall) নয় কি ?

বিলাস মুকুজ্যে এবার লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—ওঃ! আপনি ত দেখছি এক জন ভয়ানক—; আপনাকে ছাড়া হবে না, মশাই। যেমন দয়া করে এসেছেন, তেমনি আমাদের ছেড়ে আবার যেন কোথাও উঠে যাবেন না।

শিবু মুস্তফী বিলাস মুকুজ্যের কথার সূত্র আরও কিছু বাড়াইয়া গেলেন,—মশায়-লোক আপনি দেখছি! এ সব কত বড় মাথার দরকার! থাকুন, থাকুন, আমাদের এইখানেই থেকে যান, আমরা অনেক কিছু তাহ'লে মশায়ের কাছ থেকে—

শশধর কহিলেন, তা ত থাকবেন, কিন্তু মুকুজ্যে, তোমার নাতিটিকে একটু সামলে রেখো। ওঁর স্ত্রীর যখন একটু তোমার গিয়ে 'ইয়ে' আছে, তখন—বুঝছ না?

হ্যাঁ, সে আমি ঠিক করে দেবো এখন, মোটেই এ বাড়ীতে যাতে আর না আসতে পারে।

জয়গোবিন্দ বলিলেন, তার চেয়ে রজনী বাবু আপনি ওঁর যদি চিকিৎসা করেন ত ওটা সেরে যেতে পারে। সিপিয়া সিপিয়া; সিপিয়া থ্রি—এতেই কাজ হবে। আপনি নিজেও ওটা এক ডোজ ক'রে খেতে পারবেন—তাতে' 'ব্রেণে'র আপনার খুব উপকার হবে।

সহসা রজনী বাবুর 'ব্রেণ'-এ ইঁহাদের ভদ্রতা রক্ষার কথাটা উদয় হইল; কহিলেন, আপনারা চা খাবেন কি?

জয়গোবিন্দ কহিলেন, চা?—তা হ্যাঁ—থাক্, কষ্ট করার আর দরকার নেই।

শশধর কিঞ্চিৎ নড়িয়া বসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ,—খাই ত আমরা সবাই, আর খাবার সময়টাও হয়েছে বটে। তা থা-ক্-ক্, বাড়ী গিয়েই সব খাব'খন।

শিবু মুস্তফী কহিলেন, না-না; কষ্ট ক'রে আর ও-সবের হাঙ্গামা করতে হবে না আপনাকে। উনুন-টুনুন জ্বলছে কি আপনার? জল গরমের সুবিধা হবে ত?

বিলাস মুকুজ্যে কহিলেন, উনুন জ্বলেও যদি, রান্নাঘরে সম্ভবতঃ ওঁর প্রবেশাধিকার আছে কি? কেমন কি না বলুন। বলিয়া মুকুজ্যে হাসিয়া উঠিলেন।

এদিকে আসন্ন যে বিপদটিকে রজনী ডাকিয়া লইলেন, তাঁহার গুরুত্বের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক-পা এক-পা করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার কালে, বার বার তাঁহার মনে ভয় জাগাইতে লাগিল—চা-প্রস্তুতের হাঙ্গামার কথা। ঘরের পিছনদিকের সেই পরিত্যক্ত, ভগ্ন, একরত্তি চালাটুকু,—সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-ভাড়াটিয়া কাহারো ছাগল রাখিবার স্থান,—সেইখানে তাঁহার চা-এর সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় সেইখানে বসিয়া তাঁহাকে আপনার হাতে আপন চা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিপদ সে জন্যও নয়; বিপদ—এই অসময়ে পাঁচ কাপের দুধ লইয়া। এ সময় কুসুম কাপড় ছাড়িয়া দুধ দিতে রাজী হইবে কি? তবে একটা আশা যে, যদি কুসুম ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে, যাহা করিতে নাই বলিয়া দ্বিতীয় ভাগ হইতে সকলে পড়িয়া ও শুনিয়া আসিতেছে, তিনি তাহাই করিয়া দুধের বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দুধ লইতে পারেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বাটীতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া রাখিতে পারেন।

রজনী নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

৩

কবি যে বলিয়াছেন—'রমণীর মন,—সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন'—কথাটা একেবারেই বেঠিক। রমণীর মন—অর্থাৎ কি না নারীচরিত্র বুঝিতে একদণ্ডও বিলম্ব হয় না। যেহেতু, কাল সকালে যখন পাড়ার স্ত্রীলোক কয়টি প্রবল ঔৎসুক্য লইয়া নূতন ভাড়াটীয়াদের বাড়ী আসিতে আসিতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের মনের ঔৎসুক্য বেশীদিন চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, দু'একদিনের মধ্যেই এ বাড়ীতে আসিয়া অযাচিত দর্শন দিবে এবং চীৎকার ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হইয়া যাইবে।

ঘটিয়াছেও তাই। বৈকালের দিকে তাহারা এ বাটীতে আসিয়া কুসুমের সহিত আলাপে রত হইয়াছে।

ঘরের বাহিরে, রোয়াকের একধারে, কুসুম সকলকে বসাইয়া, নিজে হাত তিনেক তফাতে বসিয়াছিল।

হরুর পিসী বলিল, তাই ত বৌমা, একলার ঘর, নিজেকেই ত সব কর্ত্তে-কর্ম্মাতে হয়! তা', একটা তোলা-ঝি রাখলেও ত মা অনেকটা খাটুনি কম হয়।

কুসুম কহিল, ঝি রাখব কি, বড় নোংরা—বড় নোংরা! বাইরে-কার কি কাপড়ে সব আসবে, ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে সব একাকার ক'রে ফেলবে। আমায় আবার সব ধোয়া-ধুয়ি ক'রে মরতে হবে। তার চেয়ে এ বেশ আছি, মা।

কানাইয়ের মা কহিল, আপনার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ও কি হয়েছে বলুন ত ?

হয় নি কিছু ; অঙ্গুলের গলিগুলো হাজা-ধরে ঐ রকম সাদা সাদা হয়েছে।

কালীর বড় দি' কহিল, জলটা একটু বেশী ঘাঁটা-ঘাঁটি করেন বোধ হয়, তাই—

কুসুম কহিল, হ্যাঁ, মা।

ইতিমধ্যে মতিলালের বৌ ও নীলুর দিদিমার মধ্যে ক্ষণেকের জন্য একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল এবং তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে এক সেকেণ্ডেরও সাধনার দরকার হয় না।

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সকলে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে নীলুর দিদিমা বলিল, নীলেটাকে খুব শাসন ক'রে দিয়িছি, আর আসবে না। তুমি মা, সদরের খিলটা কিন্তু দিয়ে রেখো। ওরা এখানে ত থাকে না। ওর মায়ের অসুখ ব'লে ওমাসে ওদের এখানে এনেছি ; এই আবার সব চলে যাবে। পাজীটাকে রেখে কি আসবারই জো আছে ! তার মায়ের কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে তবে এসেছি।

সকলে চলিয়া গেলে কুসুম দালানের মধ্যে আসিল এবং পরিহিত বস্ত্রখানি খুলিয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াই একখানি গামছা পরিয়া ফেলিল। তাহার পর রোয়াকটি ধুইয়া ফেলিবার মানসে ঘরের পিছন দিক্ হইতে ঝাঁটা ও বালতি লইয়া আসিয়া দেখিল,—রোয়াক-সংলগ্ন জলপূর্ণ চৌবাচ্ছাটার ধারে দাঁড়াইয়া—নীলু। তাহার দুই হাতে দুই গাছা কঞ্চি, আর সেই কঞ্চি দিয়া পরমানন্দে রোয়াকের উপর হইতে

ঝুঁকিয়া পড়িয়া একান্ত মনে চৌবাচ্ছার জল নাড়িতেছে আর নিজের মনে বলিয়া যাইতেছে—

'কাগ্ দাকে, থালিক দাকে, আল্ দাকে ফিঙে।

তালগাথেতে বেগুন ধোলে, বেগুণগাথে ঝিঙে।'

আজ আর কুসুম কিছুমাত্র চম্‌কাইল না—বা চেঁচাইয়া উঠিল না; কাক-শালিক-ফিঙের ডাকেও না, তালগাছেতে বেগুন বা বেগুণগাছেতে ঝিঙে দেখিয়াও না। আজ খালি নীলুর হাতটি ধরিয়া সদরের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, যাও ত বাবা, বাড়ী যাও।

নীলু বলিল, এই ত বালী।

এ বাড়ীতে ভূত আছে, ধরবে; আর এসো না।

ধল্‌বে? ঈ ই থ! লাথির বালী মাল্‌বো তাহোলে—

আস্তে আস্তে তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া, কুসুম সদরের খিলটা লাগাইয়া দিল। আজ তাহার নিজেরই ত্রুটি ঘটিয়াছিল। ইহারা চলিয়া গেলে, রোয়াকটি ধুইবার জন্য ও নিজের কাপড়খানা ছাড়িবার জন্য মনে মনে এতটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সদর দরজা বন্ধ করিবার কথাটা তাহার মোটেই মনে ছিল না।

এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে কুসুম তাহার শুদ্ধিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল এবং সেই অবস্থায় শুনিতে পাইল, বাহিরে রাস্তার ধারে রোয়াকে বসিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে নীলু বার বার বকিয়া যাইতেছে—'কাগ্ দাকে, থালিক দাকে…' ইত্যাদি।

সদরের খিল সন্ধ্যার মধ্যে আর খোলা হয় নাই। খুলিবার আবশ্যকও হয় নাই। সন্ধ্যার পর কাহার ডাকে রজনী খিল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, শিবু মুস্তোফী। রোয়াকে বাসয়া শিবু ফিস্ ফিস্ করিয়া

রজনীকে বলিলেন, জয়গোবিন্দের ওষুধ আপনি কিছুতেই খাওয়াবেন না, ওর ওষুধে ছাই হবে। ও কি কিছু শিখেছে, না কিছু জানে। আমার ভাইপোটাকে মশাই—কে গো, শশধর না কি ?

হঁ্যা দাদা।

শশধর কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু মুস্তোফী দাঁড়াইয়া উঠিয়া রজনীর উদ্দেশে কহিলেন, ঢেঁকী-ছাঁটা চাল আপনি খুব পাবেন। আমাদের এ বাজারে না পান ত হাতীবাগানের বাজারে নিশ্চয়ই পাবেন।—বলিয়া তিনি গৃহের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

শশধর তখন অনুচ্চ কণ্ঠে রজনীকে কহিলেন, চুপি চুপি একটা কথা বলি। আপনি নতুন লোক এসেছেন, সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার আমাদের। শিবুর কথায় ভিজে যেন পয়সা-কড়ি কখনো কিছু ধার-টার দেবেন না ; তা হ'লেই তা যাবে, আর পাবেন না।

পরদিন সকালবেলা বাজারের মধ্যে রজনী বাবুর সহিত বিলাস মুখোর দেখা হইল। বিলাস রজনীকে সদুপদেশ দান করিলেন, যেন তিনি শশধরের সহিত বেশী মেলা-মেশা না করেন, যে হেতু ছোট ভাইটার কোথায় একরত্তি চাকরী হইয়া উহাদের যেন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হইয়াছে, অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না এবং আরও অনেক কিছু।

প্রতিবেশিগণের এই সকল অযাচিত উপদেশাবলী রজনী বাবুর কাণে প্রবেশ করিলেও মনে প্রবেশ করিবার কোন পথ পায় নাই। সে পথ, তাঁহার গবেষণা-কার্য্যের জন্য বর্ত্তমানে অবরুদ্ধ। যে হেতু, আজ সকাল হইতে এক নূতন প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিয়াছে—সকালবেলা সূর্য্য অন্য সময়ের চেয়ে বড় দেখায় কেন ? সঙ্গে-সঙ্গেই অনেক কিছু ভাবিয়া, তিনি এই সমস্যার অনেকটা সমাধানও করিয়া ফেলিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন,

আহারান্তে নিশ্চিন্ত মনে এ বিষয়ে মনোমধ্যে আলোচনা করিবেন। কিন্তু আহারের পূর্ব্বে, যখন কাঁচা আহারীয় দ্রব্যগুলি বাজার হইতে আনিয়া তিনি রান্নাঘরের সম্মুখে রোয়াকের উপর রাখিলেন, তখন কুসুম গালে হাত দিয়া এবং কপালে চোখ উঠাইয়া কহিল, দু'পয়সার কুমড়োর ফালি —ঐ একরত্তি!

রজনী কহিলেন, একরত্তি নয়—একরত্তি নয়। যখন কেনা হয়েছিল, তখন অনেকটা দেখিয়েছিল, ক্রমেই বেলা বাড়ছে ত!

তা'তে কি?

যত বেলা বাড়বে, জীবগণের দৃষ্টি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। সকাল বেলায় সূর্যকে যত বড় দেখ, দুপুর বেলা কি তত বড় দেখ।

ওমা! সে কি গো! সূয্যিতে আর কুমড়োর ফালীতে?

কিন্তু যিনি জবাব দিবেন, তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে তখন নূতন চিন্তার ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত। তিনি গামছাখানা লইয়া, বাজারের কাপড় ছাড়িবার জন্য কলতলার দিকে গেলেন এবং কিছু পরে সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজলের ছিটা লইবার জন্য রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন।

৪

আচ্ছা, হ্যাঁ গা, জুতো জোড়াটা বুঝি আর রাখবার জায়গা পাওনি, দালানের ভেতরে এনে রেখেছ! বলিহারি তোমায়!

ভুলে গেছি, তা আর কি করব?

আমার মাথাটা তুমি চিবিয়ে খেতে পার?

'উই আর সেভেন্'

মানুষের মাথা মানুষে চিবিয়ে খেতে পারে না।

বুকের ভেতর থেকে মনটা যে চুরি করতে পারে, সে সবই করতে পারে।

আহারান্তে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের মধ্যে রজনী বাবু ও কুসুমেতে আলাপ হইতেছিল। কয়েকদিন হইতে কুসুম একটু প্রফুল্লচিত্তে আছে। কারণ, দিনরাত সদরের খিল বন্ধ করিয়া রাখাতে নীলু আসিয়া আর সব নোংরা করিতে পারে না।

কুসুম কহিল, 'চারটি ঘটী দুধে ভরা, দুধ পড়ে না উপুড় করা'—এর মানে কি বল দেখি ?

রজনী বাবু নিরুত্তর। কুসুম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, পারলে না ?—গরুর বাঁট্। আচ্ছা, কি ভাবছ বল ত ?

ভাবিনি কিছু। আচ্ছা, সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ও খুব বড় দেখায়, না ?

হঠাৎ কুসুম ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া সদরের দিকে ছুটিল। ঘরের ভিতর হইতে খোলা জানালা দিয়া কুসুম দেখিতে পাইয়াছিল, এক হাতে একখানা ছেঁড়া বই, আর এক হাতে একটা পেনসিল হাতে লইয়া নীলু উঠানে দাঁড়াইয়া।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার !

সদরে খিল দেওয়া ছিল। নিশ্চয়ই ছিল। কুসুম সুস্থ শরীরে, নিজ হাতে, পূর্ণ জ্ঞানে খিল লাগাইয়া আসিয়াছে। খিল দিবার পর কেহ বাহিরে যায় নাই। রজনীর সহিত রসালাপ করিবার কালেও খোলা জানালা দিয়া কুসুম দেখিয়াছিল যে, খিলটা দেওয়াই আছে। তবে ? তবে কি করিয়া নীলু ভিতরে প্রবেশ করিল ? এ নীলু কি সেই নীলু,

যে, দ্বাপরে এই রকম ভাবেই বৃন্দাবনের সকলকে চমক দেখাইয়া দিত? এ কি সেই যশোদার নীলমণি? মহা সমস্যা।

কিন্তু মহা সমস্যারও সমাধান হইয়া গেল। অবশ্য রজনীর গবেষণা দ্বারা নয়। কুসুমেরই নানারকম আদরে, প্রশ্নে, জেরাতে জানিতে পারা গেল যে—সদরে খিল দিলে, সেই খিলের ঠিক নীচে দরজার গায় বেশ বড় একটা ছেঁদা আছে। তার মধ্যে একটা কাঠি প্রবেশ করাইয়া তাহা উপরের দিকে একটু ঠেলিলেই, আলগা খিল উঠিয়া পড়িয়া খুলিয়া যায়। অবশ্য অত মতলব করিয়া খিল খুলিবার বুদ্ধি নীলুর মাথায় ছিল না। সে খেলাচ্ছলে তাহার হাতের পেনসিলটি ছেঁদার মধ্যে ঢুকাইয়া নানাভাবে নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ খিলটি খুলিয়া যায় এবং সে ঢুকিয়া পড়ে।

যাহা হউক, সেইদিনই ছুতার মিস্ত্রী আনাইয়া দরজার সেই ছিদ্রটি বন্ধ করা হইল এবং খিলটি যাহাতে চাপিয়া বসে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল। অধিকন্তু একটা লোহার ছিট্‌কিনিও লাগান হইল।

আজিকার এই সব হাঙ্গামায় রজনীর গবেষণায় বেশ কিছু গোলমাল হইয়াছিল। তিনি মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া মনে মনেই বলিলেন, মহা আপদের হাতেই পড়া গেছে। কতদিনে যে এ আপদের শান্তি—।

সেই দিনই জয়গোবিন্দ ডাক্তার জোর করিয়া কতকগুলা 'সিপিয়া'র গ্লোবিউল দিয়া গিয়াছিলেন। রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, ওষুধটা খেয়েছিলে?

কুসুম কহিল, ওষুধ ত সব ধুয়ে গেল, তা খাব কি?

ধুয়ে গেল মানে?

'উই আর সেভেন্'

মানে হচ্ছে, কোথাকার ছোঁয়া-ছুঁয়ি ওষুধ, না ধুয়ে ত আর খেতে পারি না। বড়ী কটা হাতে ঢেলে কলের জলে একটু ধুয়ে নিতে গিয়ে দেখি, হাতে আর কিছু নেই।

রজনী বাবু অপ্রসন্ন মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন।

পরদিন কোন একটা কাজে আহারাদির পর রজনী বাবুকে বাহিরে যাইতে হইল। তিনি বাহির হইয়া গেলে, কুসুম সর্ব্বাগ্রে ভাল করিয়া সদরের খিল ও ছিট্‌কিনী লাগাইয়া দিল। তার পর ঘরের মেঝেতে একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

আজ কুসুম নিশ্চিন্ত। আজ আর দরজার ছেঁদায় কাঠি দিয়া তাহা খুলিবার কোন উপায় নাই। উঃ! ছেলেটা কি গো! এত লোক থাকতে ও যেন আমাকেই পেয়ে বসেছে। সেদিন ওর দিদিমা ব'লে গেল—ওর মা'র অসুখ বলে এসেছে, শীগ্‌গিরই চলে যাবে। গেলে বাঁচা যায়, বাবা! চার বছরের ছেলে, কি দুষ্টু গো!

ভাবিতে ভাবিতে কুসুম খানিক পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। গাঢ় ঘুম নয়—তন্দ্রার মতন। সেই অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল—দুষ্টু ছেলেটা দরজার ছেঁদায় পেনসিল দিয়া যেন খিলটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে আসিয়াছে, জিনিষ ছুঁইয়া একাকার করিতেছে, কোথাকার আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া আনা ছেঁড়া বইখানার পাতা ছিঁড়িয়া বাড়ীময় ছড়াইতেছে, আর উঠানময় ছুটা-ছুটি করিতে করিতে বলিতেছে—

—'কাগ দাকে, থালিক দাকে, আল দাকে ফিঙে।
তাল গাথেতে বেগুন ধোলে, বেগুন গাথে ঘিঙে।'

সহসা কুসুমের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু চাহিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই

সবিস্ময়ে দেখিল, খাটের উপরে বিছানার ঠিক মধ্যস্থলে বসিয়া নীলু প্রসন্ন-মনে ঐ ছড়াটা গাহিতেছে।

অপরাহ্ণে রজনী বাটী ফিরিলে কুসুম বলিল, আমি কিছুতেই আর এ বাড়ীতে থাকব না। আমার জাত-জন্ম সব গেল। একগাদা বিছানা আজ সব কাচতে হয়েছে। তুমি কালকেই অন্য বাড়ী দেখ।

রজনী বাবু বিশ্রাম করিবার অবসরও পাইলেন না। অন্ধকার সপ্ত-কাণ্ড রামায়ণের আদি অন্ত তাঁহাকে শুনিতে হইল। শুনিয়া কহিলেন, খিল দোয়া ছিল, ঢুকলো কোথা দিয়ে?

মুখনাড়া দিয়া কুসুম ঝাঁঝের সহিত বলিল, পুরোণো ধ্যাড়্-ধেড়ে বাড়ী—চারিদিকে ভাঙ্গাচোরা—ঢোকবার ভাবনা কি?

মোটের উপর জানা গেল, এই বাড়ী আর বিলাস মুকুজ্যের বাড়ীর মধ্যে যে এক ফালি জমী পড়িয়া আছে, সেই দিকে এ বাড়ীর দালানের একটা জানালা আছে। তাহার একটা গরাদে এমন ঢিলা যে, তাহা একটু টানিলেই খুলিয়া আসে, আবার একটু চেষ্টাতেই তাহা আট্‌কানো যায়। নীলু সেই গরাদে সরাইয়া আসিয়াছে।

রজনী বলিলেন, জানালাটার কবাট বন্ধ ক'রে রাখলেই ত আপদ চুকে যায়।

এবার অধিকতর উচ্চকণ্ঠে কুসুম বলিল, এ বাড়ীতে আমি কিছুতেই থাক্‌ব না।

রজনী আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না। রোয়াকের কুলুঙ্গীর মধ্যে জুতাজোড়াটি খুলিয়া রাখিয়া, সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজলের ছিটা লইবার অপেক্ষায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৫

বরাহনগর গঙ্গাতীরে ছোট একখানা একতলা বাটী।

কয়েকদিন হইল রজনী বাবু এই বাড়ী ভাড়া লইয়া এখানে আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া কুসুম নীলুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বটে, কিন্তু বাড়ী খোঁজা এবং ওঠ-উঠির হাঙ্গামায় রজনী বাবুর সূর্য্যের গবেষণা কার্য্যে অনেকটা পরিমাণ সময় এবং শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একদিন দুপুর বেলা তিনি উঠানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া বার বার সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; সেই সময় কুসুম তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, বড্ড শীত্-শীত্ করছে, বোধ হয় জ্বর-টর কিছু হবে।

খানিক পরেই কম্প দিয়া কুসুমের জ্বর আসিল। তখন সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

তিন চার দিনের মধ্যে তাহার জ্বর আর রেমিসান হইল না; উপরন্তু বুকে-পিঠে-পাঁজরে ব্যথা। রজনী বাবু একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। তিনি দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন এবং বলিলেন, বুকে-পিঠে বেশ সর্দ্দী বসেছে, খুব সাবধান। মোটে যেন না ওঠেন আর জল-টল না ঘাঁটেন। কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। কুসুমকে উঠিতেও হয় এবং একটু-আধটু জল না ঘাঁটিলেও চলে না। রজনী বাবু নিজ হাতেই নিজের জন্য যা হোক দুটা রাঁধিয়া লয়েন, আর কুসুমের জন্য পথ্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিবে। এদিক্ লইয়া থাকিলে ওদিক্ হয় না। রোগীর কাছে বসিয়া থাকা, তাকে ঔষধ খাওয়ান, দেখাশুনারও ত দরকার।

রোগ-শয্যায় শুইয়া কুসুম ভাবিতে লাগিল, বিছানায় পড়ে থেকে সব গেল আর কি! ছোঁয়া-ছুঁয়িতে সব একাকার হচ্ছে! যা'ক, সেরে উঠি তার পর—। তবে একটা কথা হচ্ছে, গঙ্গা-গর্ভ; এখানে সবই শুদ্ধ।—এই 'গঙ্গা-গর্ভ' কুসুমকে এ অবস্থায় যথেষ্ট সান্ত্বনা দিল।

এই বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি খুব সৎ এবং পরোপকারী। কয়েকখানা বাড়ীর পরই তাঁহার নিজের থাকিবার বাড়ী। তিনি আসিয়া রজনী বাবুকে অভয় দিলেন, যে-ক'দিন আপনার স্ত্রী না সেরে ওঠেন, সে ক'দিন আমার স্ত্রী দিন-রাত তাঁর কাছে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করবে এখন। কোন চিন্তা নেই; ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ—বিশেষ করে আপনি যখন আমারই বাড়ীতে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী আসিয়া কুসুমের সেবা-শুশ্রূষার ভার লইল; রজনী বাবু হাঁফ ছাড়িলেন এবং আপাততঃ সূর্য্য সম্বন্ধে গবেষণা কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রাখিয়া, রান্নাঘর ও রন্ধন বিষয়ে গবেষণায় মনোযোগ দিলেন।

প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী এ-বাটীতে আসিবার পর দুই দিন কুসুমের আর জ্ঞান ছিল না। ঐ দুই দিন তাহার বিঘোরে কাটিয়াছে। তৃতীয় দিনে কুসুম চোখ চাহিল, তাহার অল্প অল্প জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। রোগশীর্ণ দেহে, দুর্ব্বল মস্তিষ্কে তাহার যেন মনে হইল, বহুদূরে—এ-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন—যেন কোথাকার এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে সে ছিল। সেখানে বাতাসের স্পর্শ সুখ-শীতল; আকাশের নীল রংয়ে সোনার রেখা টানা। সেখানে গাছে গাছে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ঝোপে-ঝাড়ে রং-বেরংয়ের নূতন রকমের হাজার হাজার পাখী মিলিয়া নূতন সুরে নূতন ছন্দে যে গান গায়, কাণের ভিতর দিয়া সে সব অমৃতের মত প্রাণে গিয়া পৌঁছায়। সেখানকার পথের ধারে ধারে, কুঞ্জে, কাননে যে সব ফুল ফোটে, কিবা

তার রং, কিবা তার মাধুর্য্য, কিবা তার কোমলতা, কিবা তার গন্ধ! আর সেই আকাশ-বাতাস-কুঞ্জ-কানন-ফুলের মাঝে কি সুন্দর একটি ছোট-ছেলে! সে তার কচি কচি হাতে হাত-তালি দেয় আর নাচিয়া নাচিয়া গায়—

'কাগ দাকে, থালিক দাকে, আর দাকে ফিঙে।
তাল গাথেতে বেগুণ ধোলে, বেগুণ গাথে ঘিঙে।'

সহসা তাহার কাণে গিয়া বাজিল, মাথার ধারে বসিয়া প্রফুল্ল বাবুর স্ত্রী বলিতেছে—'বাবা, কিছু যেন হাত দিয়ে ছুঁয়ো না।'

কুসুম চোখ ফিরাইয়া দেখিল—নীলু।

*   *   *   *

নীলুকে দেখেই আমি সব বুঝিছি, বোন্। তা হোলে এই বরানগরেই তোমার শ্বশুরবাড়ী?

নীলুর মা কহিল, আমিও বুঝতে পেরেছিলুম, দিদি। নীলুই বুঝিয়ে দিয়েছিলো। তুমি বেহুঁস হয়ে দু'দিন পড়েছিলে, কিছুই ত আর জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। নীলু দিনের মধ্যে বিশবার তোমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকে,—মাথী, ওথ্না—ওথ্না।

ও যে আমার যশোদার নীলমণি! ও যে আমার নারায়ণ—বুকের ধন। এত দিন কি ভুলই করেছিলুম, বোন! ওকে ছেড়ে আর আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে পারব না। আয় ত বাবা, আমার কাছে সরে আয়, আর তোর সেই—'কাক ডাকে শালিক ডাকে' একটি বার বল্ ত।

'উই আর সেভেন্'

ইহারই দিন কতক পরে, বাজারের রাস্তায় রজনীর সহিত হঠাৎ একদিন জয়গোবিন্দ ডাক্তারের দেখা হইল। জয়গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার স্ত্রী কি রকম—? সে ভাবটা একটু কমেছে ?

রজনী একটু ব্যস্ত ছিলেন। ব্যস্ততার সহিত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ,—সে জিনিষটা একেবারেই গেছে।

চমকিত হইয়া জয়গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, টোট্যালি কিউরড্ ? বলেন কি ? কা'র চিকিৎসায় সারলো ?

নীলমণি চট্টোপাধ্যায়—বলিয়া রজনী হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন।

চৈতোন্ চক্কোত্তী

তাহার নাম নবচৈতন্য চক্রবর্ত্তী। সংক্ষেপে লোকে ডাকিত, চৈতোন্ চক্কোত্তী।

চৈতান্ চক্কোত্তী আপন জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়া সুরু করিল, "জীবনটা আমার হট্টোগোলে ভরা। এর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনলে তোমরা সব চম্‌কে উঠ্‌বে। এ জীবনের ওপর দিয়ে ফাগুনের ঝিরি-ঝিরি হাওয়াও ব'য়ে গ্যাচে আবার কাল-বোশেখের প্রচণ্ড ঝড়ও নাস্তা-নাবুদ ক'রে গ্যাচে। এক হিসেবে, আমার এ-জন্মের এই জীবনটা অমূল্য। কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত চোখের জল, কত আশা, কত আনন্দ, কত ভয়, কত বিপদ,—এই পঞ্চাশ বছরের দেহমনটাকে আঁকড়ে ধ'রে এসেচে আর গ্যাচে, তা শুন্‌লে তোমরা চমকে যাবে।—১২৯১ সালের জ্যষ্টি মাসে আমার জন্ম হয়। আমার বাবা......"

কিন্তু চৈতোন্ চক্কোত্তীর জীবনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিবার আগে, কি সূত্রে এই জীবনী বর্ণনার প্রয়োজনটা আসিয়া পড়িল, ভূমিকাস্বরূপ তাহা পূর্ব্বে একটু বলিলে ভাল হয়। শুধু ভালই নয়, আবশ্যকও বটে। সুতরাং ৯১ সালটাকে কিছুক্ষণের জন্য পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিয়া, বর্ত্তমান ১৩৪১ সালের ঘটনাটা দুই এক কথায় পূর্ব্বে বিবৃত করা যাউক।

যে স্থলে গড়িয়াহাট রোড ও রাসবিহারী য়্যাভেনিউর কোলাকুলি হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কর্পোরেশনের একটি স্কুল আছে। একদিন চৈত্রের শেষে, স্কুলের মাষ্টার অক্ষয় রায় স্কুলের আফিস-ঘরে

গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। হেড-মাষ্টার ছেলেদের অঙ্কের কাগজ দেখিতে দেখিতে তাহার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া কহিলেন, "আপনার ভাগ্‌নাকে পাঠিয়ে দিন না অক্ষয় বাবু। সে গিয়ে আন্‌তে পারবে না ?"

কথাটা এতই মূল্যহীন যে, অক্ষয় কথাটার কোনরূপ উত্তর দেওয়ার আবশ্যক মনে করিল না; শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ভাগ্‌না!—সে গিয়ে তার মামীকে আন্‌বে! 'ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো'! কোথায় কালীঘাট, আর কোথায় সেই বর্দ্ধমান জেলার বাবুই ডাঙ্গা! তিনটে রেল চাপ্‌তে হবে, দু'টো নদী পার হ'তে হ'বে। তার ওপর·········

অক্ষয়ের স্ত্রী আজ ছয় মাস হইল বাপের বাড়ী গিয়াছে। এখানে শরীর খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে গিয়া সারিয়াছে। এইবার আসিবে। অক্ষয় চিঠি দিয়াছে, ৭ই বৈশাখ ভাল দিন, সেইদিন উহাকে লইয়া আসিবে। এদিকে কর্পোরেশনের আফিসেও এক দরখাস্ত করিয়া ৬ই আর ৭ই ছুটি চাহিল। ৮ই ছিল রবিবার। সুতরাং বেশ সুবিধাই হইবে। কিন্তু কাহার মুখ দেখিয়া যে সে আজ উঠিয়াছিল! স্কুলে আসিতেই, আফিস হইতে দরখাস্তের উত্তর তাহার হাতে আসিল— 'গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে আপনি ছুটি পাইবেন না, যেহেতু···।' যেহেতুর কৈফিয়ৎ পড়িবার আর তাহার ইচ্ছা হইল না। চিঠিখানা অশ্রদ্ধার সহিত পকেটে পুরিয়া বিষণ্ণ মুখে প্রথম ঘণ্টার অঙ্ক কষাইতে, 'ক্লাস ফোর'-এ প্রবেশ করিল।

তারপর তিন পিরিয়ড্ ধরিয়া ক্লাসে সে কি পড়াইয়াছে, কি অঙ্ক কষাইয়াছে, তাহা নিজে সে জানে না,—ছেলেরা হয়ত কিছু কিছু

জানিতে পারে। তিন পিরিয়ড পরে টিফিনের ঘণ্টা হইলে সে হেড্-মাষ্টারের নিকট হইতে বাকী কয় ঘণ্টার জন্য ছুটি লইয়া স্কুল পরিত্যাগ করিল। স্কুল পরিত্যাগের কারণ, হঠাৎ শরীরের অসুস্থতা, অর্থাৎ ভয়ানক মাথাধরা এবং জ্বরভাব, এবং—ইত্যাদি।

বাসায় আসিবার পথেই, রাসবিহারী এভেনিউর উপর ছোট একটা তিন-কোণা পার্ক পড়ে। এটি যেন ধনীদের পল্লীমধ্যে একটি কৃষকের কুটীর। যা'র অদূরেই জমকালো 'বালিগঞ্জ পার্ক', আর যার দক্ষিণেই লক্ষ লোকের লক্ষ্য, অসংখ্য প্রেমিকের প্রেমের চিহ্ন সেই ঢাকুরিয়া 'লেক'—সে সব ফেলিয়া তাকে আর কে আদর করিবে? তাই এই নগণ্য, উপেক্ষিত পার্কটির মধ্যে কেহই বড় একটা প্রবেশ করে না। আজন্ম ইহা যেন সকলের অশ্রদ্ধা-অনাদরে নীরবে দাঁড়াইয়া শুধুই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আসিতেছে।

এই তিনকোণা পার্কের মধ্যে অক্ষয় শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাথার ছাতাটি বন্ধ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। বসিয়াই, অক্ষয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কি গরমই প'ড়েচে! মশা'য়ের বাড়ী এখানেই হবে বোধ হয়?"

—"হ্যাঁ। তবে বাড়ী নয়; বাসা।"

—"বাসাটি কোথায়?"

—"কালীঘাটে।"

—"এখানে বুঝি বেড়াতে এসেছেন?"

—"বেড়াতে ঠিক নয়। এখানকার এই কর্পোরেশন-স্কুলে মাষ্টারি করি। বড্ড রোদ্দুর। তাই এখানে গাছের ছায়াতে একটু……"

—"ছাতা নিয়ে বেরুতে হয় মশাই। আপনারা ত সব আজকালকার ছেলে, ছাতা-টাতা ত্যাগ করেচেন। আমরা সেকেলে লোক কিন্তু পারি নি।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "শুধুই ছাতা নয় তো, পাঁচটি দ্রব্য আমরা ছাড়তে পারি নি। ছাতা, চাদর, গোঁফ, পৈতে, আর……"

—"আর ?"

—"আর যা, তা আর ব'লব না।"

পরস্পর আলাপ একটু গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কথায় কথায় অক্ষয় তাহার স্ত্রীর অসুখ, পিত্রালয়ে যাওয়া, গিয়া সুস্থ হওয়া, ৭ই বৈশাখ ভাল দিন, ঐ দিন তাহাকে লইয়া আসিবার সঙ্কল্প, ছুটির দরখাস্ত, তাহা না-মঞ্জুর হওয়া প্রভৃতি সকল কথাই পথের মাঝের হঠাৎ-বন্ধু বিষ্টু বন্দ্যোর কাছে অকপটে বলিয়া দুঃখের ভার কতকটা হাল্কা করিয়া, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কহিল, "মহা বিপদেই এখন পড়লুম মশাই। ৬ই আর ৭ই দুটো দিন ছুটী পেলে……"

—"পাবেন নিশ্চয়। এমন অকাট্য দরকার যখন, তখন ছুটি মারে কে ? ছুটি হ'তেই হবে। শুক্কুর আর শনিবার তো ?"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর উভয়ে উঠিয়া পড়িল এবং অক্ষয়ের বাসার অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখান হইতে বিদায়-গ্রহণ কালে বিষ্টু অক্ষয়কে অভয় দিয়া কহিল, "কোন চিন্তা নেই। শুক্কুর বারে স্কুলে গিয়ে শুন্‌বেন যে, দু'দিন ছুটি ! এখানা আমার কাছেই থাক্।" বলিয়া অক্ষয়ের ছুটি নামঞ্জুরের চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া বিষ্টু চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল, "শুক্কুরবার বেলা বারটা একটার সময় ঠিক্

আমি আস্‌ব আবার। তারপর—" হাত ও মুখের ভঙ্গী করিয়া ছড়া গাহিবার সুরে কহিল, "তারপর,—

শঙ্কা ছেড়ে, ডঙ্কা মেরে, বাবুই-ডাঙ্গা গিয়ে,
ফিরে আস্‌বেন বৌমাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে।

—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ হাঃ……"

বিষ্টু অন্তর্ধান হইল।

শুক্রবার বেলা ১০৷৷০টার সময় স্কুলে যাইতেই, হেড মাষ্টার কহিলেন, "আজ আর কাল দু'দিন ছুটি। ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে বলে দিন যে, গড়িয়া-মহারাজের শততম জন্মদিন উপলক্ষে দু'দিন স্কুল বন্ধ থাকবে।" অফিস হইতে এতৎ-সম্বন্ধে যে সার্কুলারখানি আজই সকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মাষ্টার মহাশয়রা মহানন্দে তাহা বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন—The Head-master of the Gariahat School is hereby informed…… ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ গড়িয়া-মহারাজের শততম জন্মদিন উপলক্ষে গড়িয়াহাট স্কুল আগামী ৬ই ও ৭ই (শুক্র ও শনিবার) বন্ধ থাকিবে।

ক্লাস ছুটি দিয়া প্রফুল্ল মনে অক্ষয় বাসায় ফিরিয়া দেখিল, বিষ্টু বন্দ্যো বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছে ও রামধন চাকরের সঙ্গে গল্প করিতেছে। অক্ষয় সহাস্যে কহিল, "কি ব্যাপার বলুন তো ? ছুটি তো নির্ঘাৎ হ'ল বটে ! খুব আপনার মতলব। কিন্তু এই নিয়ে গোলমাল একটা বাধবেই। সার্কুলারের ফর্মখানা হুবহু নকল করে বুঝি ছাপাতে হয়েচে ?"

—"নিশ্চয়ই। পাঁচটা টাকা তবে খরচ হ'ল কিসে ? দিন, টাকা পাঁচটা এইবার দিয়ে দিন তাহোলে। তারপর 'দুর্গা দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়ুন। ক'টায় ট্রেণ ?"

—"আড়াইটের ট্রেণে যাব, সন্ধ্যার পর পৌঁছাব। আচ্ছা—গড়িয়া মহারাজ ব'লে সত্যিই কেউ ছিলেন না কি ?"

—"তা, গড়িয়াহাট যখন, তখন গড়িয়া-রাজ একজন ছিলেন বই কি ?"

—"আসুন, বাড়ীর মধ্যে আসুন।" উভয়ে গৃহ মধ্যে আসিল। "উঃ! সার্কুলারখানা যেন একেবারে হুবহু আমাদের অফিসের সত্যিকার সার্কুলার। নাম সইটি পর্য্যন্ত ধরবার জো নেই। যাক্, ভারি উপকার হল আমার।" টাকা পাঁচটা অক্ষয় তাহার হাতে দিয়া কহিল, "একটু বসুন, আমি আস্চি।"

ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া অক্ষয় বলিল, "যাক্, আপনার দ্বারা আমার একটা মহা উপকার হল, এঁরা এলে আর একদিন দয়া করে আসবেন।"

বিষ্টু বন্দ্যো আর অপেক্ষা করিল না। টাকা পাঁচটা প্রফুল্লচিত্তে ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, "বৌমাকে এনে ফেলুন আগে অক্ষয় বাবু; তারপর একদিন এসে পেট ভরে লুচি খেয়ে যাব নিশ্চয়ই।"

অক্ষয় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। উঃ, কি বিপজ্জনক কাজ! একেবারে পুকুরকে পুকুর চুরি। সোমবার দিনই একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে আর কি! যাক্ গে; আমার কি? এর জন্মে তো আর আমি দায়ী নই। কে-ই বা দায়ী? হেড্-মাষ্টারও নয়। সে সার্কুলার পেয়েচে, ছুটি দিয়েচে। ধরা পড়লে বিষ্টু বাঁড়ুয্যেরই—। তা, ধরাই বা পড়বে কি করে। সার্কুলার ফর্মখানার হুবহু নকল ছাপা। ওটা কি—ছাপিয়েচে? তা হ'লে যে প্রেস থেকে—না না,—বোধ হয় ওখানা অফিস থেকেই কোন গতিকে যোগাড় করেচে। তারপর কোথা থেকে টাইপ করিয়েচে। আর সইটে নিজেই বে-মালুম···! ক'টা বাজলো? অক্ষয় তার হাত-ঘড়ি দেখিতে গিয়া দেখিল,

টেবিলের উপর হাত ঘড়িটা নাই। কি হল? বালিসের তলায়? কই? —নেই তো! মণি-ব্যাগটা? একি! সেটাও—উচ্চৈঃস্বরে অক্ষয় হাঁকিল, "রামধন, রামধন।"

রামধন আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যারে, আমার ঘড়ি আর মনিব্যাগ?"

"জানি না তো বাবু।"

অক্ষয় ভ্যাবা-চাকা খাইয়া কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর শশব্যস্তে কহিল, "দেখ্ দেখ্—ঐ ব্যাটারই কাজ। ছুটে যা—ছুটে যা, উঃ! বেটা ত মহা ধড়ীবাজ!"

রামধন তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অক্ষয় চারিদিকে তাহার দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে! ফাউণ্টেন পেনটাও গ্যাচে দেখচি!" সে নিজেও ছুটিয়া বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল। কিন্তু দেখিবে আর কাহাকে? যে না-মঞ্জুর ছুটিকে এমন ভাবে ঝটিতি মঞ্জুর করাইয়া দিতে পারে, সে লোকও যেমন সোজা নয়, তাহার সন্ধান পাওয়াও তেমনই সোজা নয়। সুতরাং হতাশ হইয়া অক্ষয় ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল এবং কিছু পরে তস্য ভৃত্য রামধনও বৃথা গলদঘর্ম্ম হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আর বেশী দেরী করাও চলে না। ট্রেণ আড়াইটায়। হয়তো এখনই না বাহির হইলে আর ট্রেণ পাওয়া যাইবে না। কয়টা যে বাজিয়াছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। ট্রেণের ভাড়াও নাই। ব্যাগ শুদ্ধই ব্যাটা……!

রামধনকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল, দু'-এক টাকা তার আছে কিনা? রামধন কহিল, "গোটা পাঁচেক টাকা আচে বাবু।" তখন রামধনের কাছ হইতে সেই পাঁচটী টাকা ধার লইয়া অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

ট্রামে বসিয়া অক্ষয় বিষ্টু বন্দ্যোর কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার চেহারা, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার পঞ্চ দ্রব্যের প্রতি প্রীতি, তাহার……। চারটে জিনিসের সে নাম ক'রে পঞ্চমটার আর নাম করেনি। সেটা কি বেটার এই চুরী বিদ্যে নাকি? উঃ! কি শয়তান রে বাবা! বেটা আবার মুখে মুখে ছড়া বাঁধতেও মজবুত!—'শঙ্কা ছেড়ে ডঙ্কা মেরে বাবুইড্যাঙ্গা গিয়ে'—উঃ! wonderful!

* * * *

অক্ষয় স্ত্রীকে আনিয়াছে।

গ্রীষ্মের ছুটির মাসের মাহিনা সমেত দুই মাসের বেতন একসঙ্গে পাওয়ায়, সে একটা হাত-ঘড়ি আর একটা ফাউন্টেন পেনও কিনিয়াছে। বিষ্টু বন্দ্যো বলিয়াছিল, বৌমা এলে পরে একদিন এসে পেট ভরে খেয়ে যাব। অক্ষয় তো তার ঠিকানা জানিত না, নহিলে নিশ্চয়ই একদিন তাহাকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিত। অর্থাৎ বিষ্টুর কথা অক্ষয় কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। যত দিন যাইতে লাগিল, অক্ষয়ের মনে বিষ্টু যেন ততই অক্ষয় হইয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সরকার বাহাদুর যত সব বাজে ব্যাপারের রিসার্চের জন্যে রাশি রাশি টাকা অপব্যয় করচেন। তার বদলে যদি এই বিষ্ণু-ব্যাপারের একটা ভাল রকম রিসার্চের ব্যবস্থা হয়, তাহ'লে একটা সত্যিকারের কাজ হয়।

তবে, সরকার বাহাদুর না করিলেও কর্পোরেশন অফিসসমূহে, রীতিমত রিসার্চ চলিতে লাগিল। কে বা কাহারা জাল সার্কুলার জারী করিয়া গড়িয়াহাট-স্কুলে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলিতে লাগিল। সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যকর সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

যাহা হউক, দিন ইহার জন্য বসিয়া থাকিবে না। দিনের পর দিন আসিতে লাগিল এবং যাইতে লাগিল। অবশেষে বৈশাখ কাটিল, জ্যৈষ্ঠ কাটিল, দক্ষিণ দেশ হইতে মেঘের রাশী মাথায় করিয়া আষাঢ় আসিয়া দেখা দিল।

রথের দিন রামধন জানবাজারে রাণী রাসমণির রূপার রথ দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ঘড়ি-চোরকে আজ দেখতে পেয়েছিলুম বাবু।"

অক্ষয় উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রে, কোথায় ?"

"রথের মেলায় বাবু। পাপের ফল হাতে-হাতেই তাকে পেতে হ'য়েচে। কি যে তার দুর্দ্দশা হ'য়েচে, সে আর আপনাকে কি ব'লব ! গোটা ডান হাত-খানা একেবারে দগ্‌দগে ঘা-তে ভরে গিয়েচে। তা'তে আবার পচ্ ধরেচে, মাছি ব'স্‌চে। তাই নিয়ে ভিক্ষে ক'রচে।"

অক্ষয় দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, রামধন উত্তর দিল,—"তার কাণের নীচে সেই আবটা দেখেই আমি চিনেচি।"

—"তবে তাকে ধ'রে ফেল্‌লি না কেন ?"

—"ধ'র্‌বে ধ'র্‌বো মনে করে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে আর খুঁজে পেলুম না।"

—"তুই বেটা তো দেখছি রামধন নস্—আস্ত রামকান্ত। দেখতে পেলি যখন, তখন ছুটে গিয়ে জাপ্‌টে ধ'রে ফেল্‌তে পার্‌লি না ? বোকা কোথাকার !"—আসল কথাটা কিন্তু রামধনও প্রকাশ করিল না, অক্ষয়ও বুঝিতে পারিল না। ধরিবে কাহাকে ? তার সব হাতটাই পচা ঘায়ে ভরা, ভিতর হইতে পচা মাংস ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে। তাহাকে ধরিতে কাহার প্রবৃত্তি হয় ?

'উই আর সেভেন্'

ইহারই দুই দিন পরে, অক্ষয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যাইবার পথে শ্যামবাজারে তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বন্ধুটি বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন একটা বিপদ-টিপদ কিছু হইয়াছে, অনুমান করিয়া অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কিহে—খবর সব ভাল তো?"

বন্ধু কহিলেন,—"ভাল। এসো।"

—"তোমার সেই হাইকোর্টের মকদ্দমা—?"

—"জিত হ'য়েচে।"

—"তবে?"

—"তবে কি?"

—"এই রকম বিমর্ষ হ'য়ে বসে রয়েচ?"

—"ও কিছু নয়। এক বেটা বড় ঠকিয়ে খানকতক থালা-গেলাস নিয়ে ভেগেচে। বেটা আমাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে গ্যাচে।"

আসন গ্রহণ করিতে করিতে অক্ষয় সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি বলতো?"

অক্ষয়ের বন্ধুটি মোটামুটি ব্যাপারটা যাহা বলিল তাহা এই :—

কয়েকদিন আগে সামনের বাড়ীটা বিয়ের জন্তে কাহারা ভাড়া লইয়াছে। কাল সকালে উহাদের একটা বুড়ো গোছের লোক আসিয়া বন্ধুটিকে কহিলেন, বিয়েতে সব দয়া করে যাবেন, দেখবেন শুনবেন, আমরা বিদেশী লোক। তার পর বলিলেন, আজ এ-বেলার মত গোটা ৫।৬ গেলাস আর ৫।৬ খানা থালা কি রেকাব দিতে হবে। খানিক পরেই আবার আমাদের চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আজই আমাদের বাসন-কোসন সব এসে পড়বে।

বন্ধুটি কহিল, আজ বুঝি আপনাদের গায়ে-হলুদ?

—না। গায়ে-হলুদ কাল। দু'একজন কুটুম এসেচে এখন, তাদের একটু জল-টল খাইয়ে দিতে হবে। সুতরাং তাহাকে ৬টি গেলাস ও থালা ৬ খানি দেওয়া হইল। বৃদ্ধ বিয়ের দিন অনেক করিয়া যাইতে বলিয়া ঐগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর এই দুই দিনের মধ্যে সেগুলি আর ফিরিয়া আসে নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অক্ষয়ের বন্ধু কহিল, "আজ জানা গেল লোকটা সামনের ঐ বিয়ে বাড়ীর কেউ নয়। কোথাকার একটা জোচ্চোর বে-মালুম আমাদের ঠকিয়ে দিয়ে গ্যাচে।"

চোখ কপালে তুলিয়া অক্ষয় কহিল, "বল কি? এ যে দিনে ডাকাতী!"

—"হ্যাঁ; লোকটার কথায়-বার্ত্তায় সন্দেহের কিছুই ছিল না। ব'ললে আমারই নাতনীর বিয়ে। আর বিয়ের দিন যাবার জন্তে কি অনুনয়-বিনয়!"

—"উঃ! কি ভয়ানক সাহস! সেদিন আমারও—" বলিয়া অক্ষয় যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটার বয়স কত?"

—"তা বছর চল্লিশের কম তো নয়।"

—"গোঁফ সব পাকা কি?"

—"হ্যাঁ।"

—"গলায় পৈতে ছিল তো?"

—"না। কায়স্থ।"

—"গায়ের রং কি রকম বল দেখি?"

"গায়ের রং ঈষৎ তাঁমাটে। কাণ দুটো একটু বে-মানান্ বড়-বড়। একটা কাণের নীচে, গালের ধারে একটা আব।"

অক্ষয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বন্ধু কহিল, "কি ? অমন করে চমকে উঠলে যে ?"

"এই লোকটাই ! তারপর বল।"

*　　　*　　　*　　　*

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটের চাতালের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে অক্ষয় দেখিল, অদূরে একটা গাছের ছায়ায় একটা লোককে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক স্ত্রী-পুরুষ জড় হইয়াছে। লোকটা ভিক্ষার্থী। তাহার একটা পা আগাগোড়া পচা ঘায়ে ভরিয়া গিয়াছে। লাল দগ্‌দগে ঘায়ের উপর মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে। অনেকেই তাহাকে দু'একটা করিয়া পয়সা দিতেছে। অক্ষয় নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিল। লোকটাও অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়াছিল; সে-ও লাফাইয়া উঠিল। অক্ষয় ছুটিল। লোকটাও ছুটিল। তাহার খোঁড়া পায়ের ভীষণ ছুট দেখিয়া সকলে তখন অবাক হইয়া রহিল।

এ সেই বিষ্টু বন্দ্যো। যিনি পঞ্চদ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, যিনি বিয়ে বাড়ীর ক'নের দাদামশাই, রামধন সেদিন রথ-তলাতে যাহার হাত-ভরা ঘা দেখিয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক দিনের মধ্যে উহার সেই হাতের ঘা, পায়ে নামিয়া আসিল কি করিয়া ? আর সেই ক্ষত-পায়ে এত ছুট্ !

অনেক ছুটা-ছুটির পর, অনেকটা দূরে আসিয়া, অনেক কষ্টে, অক্ষয় বিষ্টু বন্দ্যোকে ধরিয়া ফেলিল। একটা নিরিবিলি জায়গায়, ঝোপের পাশে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিষ্টু কহিল,—"ক্ষমা, ক্ষমা—

বুড়ো বামুণকে ক্ষমা ক'র্তে হবে। আমার সব কথা শোন যদি, তোমার দয়া হবেই। আজ এইখানে ব'সে আমার সব কথা তোমায় বল্ব।"

অক্ষয় চমৎকৃত হইয়া কহিল,—"কিন্তু শুনেছিলুম, তোমার হাত-ভরা ঘা, সেটা তা হ'লে সত্যি নয়?"

—"সে-ও সত্যি নয়, এ-ও সত্যি নয়। তা হ'লে আর এমন ক'রে ছুট্তে পারি? ঘা কোনটাই নয়। ও একরকম মলম আছে, তাই গায়ের যেখানে লাগাবে, সেইখানটায় মনে হবে দগ্-দগে ঘা।"

—"আর ঘায়ের ওপর মাছি-বসাটা?"

—"মলমটার সঙ্গে মধু মেশানো থাকে কি না, তাই।"

—"আচ্ছা, আজ সব কথা সত্যি বল্বে?"

—"বল্ব।"

—"আমার হাত-ঘড়ি, টাকা, ফাউণ্টেন পেন—"

—"আমিই নিয়েচি।"

—"শ্যামবাজারে এক ক'নের দাদামশাই সেজে—"

হি হি করিয়া একটু হাসিয়া বিষ্টু বন্দ্যো কহিল,—"সে-ও আমি।"

—"তোমার যে নাম ব'লেচ, ওই কি ঠিক?"

—"না। আমার আসল নাম নবচৈতন্য চক্রবর্ত্তী। সকলে চৈতোন্ চক্কোত্তী ব'লেই ডাক্তো। আজ যখন তোমার কাছে স্বীকার পেয়েচি, সব কথা ব'ল্ব, তখন ঠিকই বল্ব। আমার জীবনের কাহিনী একটা শোনবার জিনিষ। বলেছিলুম না, বৌমা এলে একদিন এসে পেট ভ'রে খেয়ে যাব? আজ আমাকে নিয়ে চল। আজ তোমার ওখানে গিয়ে পেট ভরে, তৃপ্তিতে খেয়ে সারা জীবনের অদ্ভুত কাহিনী শোনাব। শুনে

চম্‌কে উঠ্‌বে। পঞ্চাশ বছরের ঘা-খাওয়া পা না হ'লে কি তুমি ছুটে আজ আমার নাগাল ধ'র্‌তে পার্‌তে? যা'ক্, চলো—যাই—।"

অক্ষয় চৈতোন্ চক্কোত্তীকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিল। তার পর পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া চৈতোন্ তাহার অৰ্দ্ধ শতাব্দীর জীবনের ইতিহাস বলিতে সুরু করিল—

"কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত চোখের জল, কত উৎসব, কত বিপদ্, এই পঞ্চাশ বছরের দেহ-মনটাকে আঁকড়ে ধ'রে এসেচে আর গ্যাচে, তা শুন্‌লে তোমরা চম্‌কে উঠ্‌বে। ১২৯১ সালের জ্যষ্ঠী মাসে আমার জন্ম। আমার বাবা আমার জন্মের আগেই মারা যান। আমার মা সেই দুর্দ্দিনে আমায় নিয়ে—"

কিন্তু চৈতোন্ চক্কোত্তীর দীর্ঘ জীবন-কাহিনী দুই এক পাতায় তো কুলাইবে না। তাহা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বিশেষ। যাহা অল্পে শেষ হইবে না, তাহা সুরু না করাই ভাল। সুতরাং ইহা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল।

———

মাটীর পুতুল

১

নীলকান্ত সিমলাই আর ধরণীধর সিমলাই দুই জ্ঞাতি-ভাই। ধরণীধর যৌবন ছাড়াইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছে। নীলকান্ত তাহাপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট। ধরণীধরের প্রতিপাল্য অনেকগুলি; নীলকান্তর মাত্র স্ত্রী ও বিধবা ভ্রাতৃজায়া। তথাপি নীলকান্তর সংসারে নিয়তই অভাব-অনটন আর ধরণীধরের সংসার তাহার ক্ষুদ্র মুদিখানা দোকানখানির আয় হইতেই সুখে-দুঃখে মোটা ভাত-কাপড়ে এক রকমে চলিয়া যায়। এই কারণে মুখে উভয়ের মধ্যে ভাব ও ভালবাসা থাকিলেও, মনে মনে নীলকান্ত ধরণীর উপর বিষম বিরক্ত এবং ততোধিক বিরক্ত আর এক জনের উপর—যিনি তাঁহার সৃষ্টির হাতে উভয়কে সৃষ্টি করিয়া একজনকে দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে পাঠাইয়াছেন, আর একজনকে অনাবিল শান্তি ও সুখের অধিকারী করিয়াছেন।

ধরণী যখন দোকানে যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যূষে নদীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিয়া আপনার ঘরখানির মধ্যে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বসে, নীলকান্ত তখন নিদ্রাভঙ্গে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চায়ের জন্য ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে। তার পর ধরণী যখন সারা সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা তাহার দোকানের কেনা-বেচা লইয়া ব্যস্ত থাকে, নীলকান্ত তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গান, গল্প, তাস, দাবা, মাছধরা প্রভৃতিতে কাটায়। এমনই করিয়া একজন পরিশ্রম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা যেখানে তাহার সংসারের ও

দোকানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে, আর একজন সেখানে আলস্য ও আরামের আশ্রয় লইয়া, সেই দোকানে ধারে উঠ্না খাইয়া, বছরের পর বছর এক একখানি করিয়া তাহার পৈতৃক জমী বিক্রয় দ্বারা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে।

ভিতরে ভিতরে নীলকান্ত ধরণীর উপর বিষম চটা হইলেও বাহিরে সে যেরূপ ভাব দেখায়, তাহাতে মনে হয়, তাহার অপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু বুঝি ধরণীর আর ধরণীতে দ্বিতীয় কেহ নাই। মুখে ধরণীর সহিত আলাপ-আলোচনায় ও কথাবার্ত্তায় যেন তাহার বুকের দরদ মুখ দিয়া ঝরণার মত ঝরিতে থাকে। নীলকান্ত ধরণীকে ডাকিয়া বলে,—"বলি, অ ধরণীদা'—তামাকটা খেয়ে যাও। দিনরাত এক মিনিটের জন্যে তোমায় বসতে দেখি না। শরীরটার দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।" ধরণী হন্ হন্ করিয়া যাইতে যাইতে নীলুর কাছে আসিয়া বসে, হাসিয়া বলে,—"শরীর যিনি দেখবার, তিনিই দেখবেন রে ভাই,—আমি কাজ করতে এসেছি, কাজ ক'রে যাই।"

"গাঁয়ের সকলই বলে,—ধরণী সিমলাইয়ের চেয়ে গাঁয়ে বড় লোক আছে অনেক, কিন্তু ও-রকম ধার্ম্মিক আর দ্বিতীয় কেউ নেই।"

আনন্দে উৎসাহে ধরণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে—"ভাই, সকলই তাঁর দয়া, নইলে আমার এক কড়ারও শক্তি নেই। আমি একটা মহা মূর্খ্য, মহাপাপী। দিনান্তে ভাল ক'রে তাঁকে ডাকবারও অবসর করতে' পারি না।"

"আমাদের বৌয়েরা বলছিল,—ভাসুরঠাকুর থাকতে এবার আমরা আম খেতে পেলুম না। হাটে না কি এবার আমের খুব আমদানী হয়েছে।"

"বলছিল না কি ?—হা-হা-হা-হা !"

পরের হাটবারে ধরণীর বাড়ী হইতে নীলকান্তর বাড়ী একশত ভাল আম আসিয়া পড়িল।

এইরূপ অন্তরের তিক্ততায় একজন মিষ্টকথার মধু ঢালিয়া দেয়, আর একজন তাহার সহজ সরল স্বভাবের গুণে তাহাতেই মুগ্ধ হয়।

সেদিন নীলকান্ত ধরণীকে কহিল—"ধরণীদা', গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে যদি বেশী কাউকে ভালবাসি, সে তোমাকে। আমার পরামর্শ তুমি শোন। চল, দু'জনে কোলকাতায় যাই। দুই ভাই একজোটে সেখানে গিয়ে যদি উপায়ের চেষ্টা করি ত গাঁয়ের মধ্যে আমাদের ওপর মাথা তুলতে আর কারুকে দেব না। চল দাদা, দোকান-টোকান তুলে দাও।"

ধরণীর উন্নতির মূল তাহার এই পৈতৃক দোকানখানির উপর নীলকান্ত বরাবরই চটা। নীলকান্তর কথার উত্তরে ধরণী বলে,—"কোলকাতায় ? ও কথা আর বলিসনি, নীলু। আমাদের মত লোকের কি কোলকাতা গিয়ে থাকা চলে ? কোলকাতা হ'ল ধনীর যায়গা। গাঁয়ে-ঘরে আছি, যখন মরব, তখন দুটি খেয়ে মরতে পারব, সেখানে গিয়ে থাকলে না-খেয়ে মরতে হবে। গরীবের গ্রামই ভাল।"

নীলকান্তও জানে যে, গরীবের গ্রামই ভাল। কিন্তু সেটা ধরণীর পক্ষে—তাহার পক্ষে নহে। তাহার পৈতৃক জমীজমাগুলি নিঃশেষে বিক্রয় বা বন্ধক দিয়াছে, কোথাও এক ছটাকও আর তা বাকী নাই। পিতল-কাঁসার জিনিষ যাহা কিছু ছিল, তাহাও প্রায় সবই মগরার গঞ্জে দত্তদের দোকানে গিয়া জমা হইয়াছে। স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়ার গায়ে দু' একখানি গহনা যাহা ছিল, তাহাও এক-একখানি করিয়া গিয়াছে। এইবার তাহার নিজের যাইবার পালা। কারণ, তাহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

কিন্তু সে যায় কোথায়? কলিকাতায়? তাহা ছাড়া ত আর যাইবার তাহার স্থান নাই। সেখানে গিয়া যাহা হউক কোন কাজকর্ম্ম না করিলে আর কোন উপায়ই নাই।

সে দিন সন্ধ্যায় চা খাইয়া, অন্য দিনের মত নীলকান্ত পাড়ায় তাসের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ রাখিয়া, তৎপরিবর্ত্তে দাওয়ায় একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল ও নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

কি করা যায়? মেয়েমানুষ দু'টো না থাকলে কোন হাঙ্গামাই ছিল না। গেরুয়া প'রে কোন একটা সহরের গাছতলায় কিম্বা কারও পোড়ো বারান্দায় আড্ডা সাজিয়ে বসতুম; তোফা ঘি, রুটী, দুধ, ছানা, হালুয়া, ওড়াতুম। কিম্বা কাশী গিয়ে, দলে নাম লিখিয়ে মজাদারী ক'রে—। বেটার ভাগ্যটা খুব জোর। ধুলোমুঠো ধরছে—সোনামুঠো হচ্ছে। ঐ একরত্তি দোকান থেকে, বেটা পঞ্চাশ বিঘে জমী ক'রে ফেললে। ধানের মরাইটা বছর বছর বেড়ে যেন পাহাড় হয়ে উঠছে। দোকানখানায় এক দিন আগুন লাগে ত ওর ঘুঘুর বাসা পুড়ে যায়! আমিই দিয়ে দিতে পারি এক দিন: কিন্তু ধরা পড়বার যে ভয় করে।

নীলকান্তর সম্মুখেই তাহার খিড়কীর প্রাচীর। তাহার ওপারে আমড়া, সজিনা, বাব্‌লা, খেজুর প্রভৃতি কয়েকটা গাছ। তাহারই অল্প ব্যবধানে কয়েক ঝাড় বাঁশ অন্ধকারে মাথা উঁচু করিয়া আবছা দাঁড়াইয়া আছে, আর তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য জোনাকী ঝিক্‌মিক্ করিয়া সেখানকার অন্ধকার-রাশিকে আরও বেশী গাঢ় করিয়া তুলিতেছে। বহুক্ষণ ধরিয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, নানা রকম চিন্তা করিয়া, নীলকান্ত স্থির করিল, সে কলিকাতাতেই যাইবে। সৎ অসৎ যে কোন উপায়েই হউক, তাহার কিছু উপার্জ্জন করা চাই। সে ধরণীর অপেক্ষা লেখাপড়া জানে, সে চালাক-চতুর, ধরণীর

মত সে ভ্যাবা-গঙ্গারাম বোকাকান্ত নয়—সে ভাগ্যলক্ষ্মীকে যেমন করিয়াই হউক, তাহার অভাবের ঘরে টানিয়া আনিয়া তবে ছাড়িবে।

নীলকান্ত অনেক লোকের বিষয়ে গল্প শুনিয়াছিল যে, তাহারা কপর্দ্দক-শূন্য অবস্থায় কলিকাতায় যাইয়া, পরে অগাধ অর্থের মালিক হইয়াছে। বৌবাজারের রাজীব সরকার মাত্র পাঁচটা টাকা লইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল, আজ তাহার বাড়ী-ভাড়ার আয় বছরে ৫৫ হাজারের উপর। বেলেঘাটার নামজাদা ধনী-মহাজন নকুড় সাঁতরা ৩০ বছর আগে একখানা ধুতি আর এগারো গণ্ডা পয়সা সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া লক্ষপতি হইয়াছিল। ভবানীপুরের যদু বোস, নেবুতলার নেপাল মুখুযো, কাশীপুরের নন্দ ঘোষাল—এঁদের সকলেরই কথা সে শুনিয়াছিল। নীলকান্ত মনস্থ করিল, সে বাড়ী হইতে একটি পয়সাও লইয়া যাইবে না, শুধু হাতেই এক কাপড়ে সে তাহার ভাগ্যের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিবে যে, তাহার তল কোথায়।

এ প্রতিজ্ঞা সে না করিলেও পারিত, কারণ, একটি কপর্দ্দকও তাহার হস্তে এ সময় ছিল না, এমন কি, রেলের ভাড়ার চৌদ্দ গণ্ডা পয়সাও তাহার সঙ্গতি নাই।

পরদিনই সে দুপুরের গাড়ীতে আসিবার অভিপ্রায়ে সকাল সকাল স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া জামা-কাপড় পরিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ক'রে কোলকাতায় যাবে, একটি পয়সাও ত কাছে নেই।—ট্রেণের ভাড়াটাও ত চাই।"

নীলকান্ত কহিল,—"চাই ত নিশ্চয়ই। দেখি, কি করতে পারি" বলিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বরাবর মোড়লদের কাপড়ের দোকানে আসিয়া অতিমাত্রায় ব্যস্ততা দেখাইয়া কহিল,—"ওহে, নোট-

ভাঙ্গানী দশটা টাকা পাওয়া যাবে ?" বলিয়া যেন পকেট হইতে নোট বাহির করিবার উপক্রম করিল।

মোড়ল কহিল,—"একটু আগে হ'লে পেতেন, এই খানিকক্ষণ হ'ল—।"

তেমনই ব্যস্ততার সহিত নীলকান্ত কহিল,—"আচ্ছা, একটা টাকা শীগ্‌গির দাও ত মোড়লের পো, বাকী ন'টা ওবেলা নেব এখন।"

মোড়লের পো তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাক্সর মধ্য হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিল। নীলকান্ত টাকাটা হাতে করিয়া বলিল,—"৯টা বাকী থাকলো, ও বেলা নোট দিয়ে নেব এখন।" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া ষ্টেশনের রাস্তায় চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে হাওড়ার ষ্টেশনে পৌঁছিয়া প্লাটফর্ম্মের একখানা বেঞ্চের উপর নীলকান্ত বসিয়া পড়িল।

মোড়লের-পোর টাকায় টিকিট কিনিয়া মাত্র সাতটি পয়সা তাহার বাকী ছিল, অথচ সারাদিনের ট্রেণ জার্ণিতে তাহার যেরূপ ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহা সাত পয়সার ক্ষুধা ত নহেই, সাত আনার কমে সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কি না সন্দেহ।

তবুও সে প্লাটফর্ম্মের দক্ষিণাংশে দত্ত কোম্পানীর বাঙ্গালী রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করিল—দু'পীস্ টোষ্ট, দু'খানা চপ, দু'পীস্ কেক্, একখানা ডবল মাম্‌লেট ও এক কাপ চা।

পরিতোষ পূর্ব্বক জলযোগ হইয়া গেলে সহসা তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া রেস্তোরাঁর মালিক বাবুটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মশাই ? পকেট-মারের হাতে পড়েচেন না কি ?"

নীলকান্ত ভীত, চকিত, লজ্জিত এবং চিন্তিত। একবার এ পকেটে, একবার ও পকেটে, একবার ট্যাঁকে হাত দিয়া কেবলই খুঁজিতে লাগিল।

"কত ছিল পকেটে ?"

"আজ্ঞে—" তাহার সেই ভীত-চকিত ভাব।

"সবই গেছে ত ?"

"সবই গেছে। আপনার দামটা এখন কি ক'রে দি। আমার এই গায়ের কোট্টা আমি খুলে—"

"গায়ের কোট্টা আর খুলে দিতে হবে না। যে দিন আবার এ দিকে আসবেন, মনে ক'রে দিয়ে যাবেন। মশায়ের নাম ?"

"জগবন্ধু দত্ত চৌধুরী।"

"এখানে বাসা কোথায় ?"

"ছিদাম মুদীর লেনে। আপনার তা হ'লে সাত আনা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি কালকেই এসে আপনাকে দিয়ে যাব। তা হ'লে আর একটু উপকার আমার করুন। দয়া ক'রে এক প্যাকেট সিগারেট আর পয়সাটাক পাণ আনিয়ে দিন। জীবনে এই প্রথম আমার পকেট-কাটা গেল, মশাই! হাত সাফাই বটে, এক বিন্দু টের পাইনি।" সিগারেট্টা ক্যাভেণ্ডার আনে যেন। অন্য সিগারেট খেতে পারি না।"

অতঃপর আরও দুই চারিটি কথার পর, পাণ চিবাইতে চিবাইতে ও সিগারেট টানিতে টানিতে নীলকান্ত চলিয়া গেল। যাইবার সময় দত্তবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"তা'হলে মোট আপনার এগার আনা হোল।" মনে মনে মোড়লের-পোর উদ্দেশে কহিল—"দেখবো, তোমার হাতের বউনির ফল কি রকম হয়।"

কিন্তু সাত পয়সার পুঁজিতে আর কতক্ষণ চলিবে? গোটা দুই চার টাকা অন্ততঃ এখনই দরকার।

বৌবাজারে একটা মাড়োয়ারীর মুদীখানা দোকানের সম্মুখে আসিয়া নীলকান্ত দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"খুব বড়িয়া ঢেঁকী-ছাঁটা চাউল হায় তোমার ?"

"হায় বাবুসাব।"

চাউল দেখা হইল। দরদস্তুর হইয়া গেল। ছয় টাকা মণ।

নীলকান্ত কহিল,—"দেখো, এক কাম করো। তোমরা কই চিনা মুটিয়া বোলাও। এক মণ ভেজো হাম্‌রা সাথ। উস্‌কো হাতমে হাম্ দশ রোপেয়াকো একঠো নোট দেগা, তোম্ চারঠো রোপেয়া হামায় দে দেও। —সম্‌ঝা ? চিনা মুটিয়া হায় ত ?"

"হাঁ, বাবু।"

"আচ্ছা, বোলাও। চাউল আচ্ছা হোয় ত, দো-চার রোজ বাদ ফিন্ এক বস্তা লে যাগা।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

অতঃপর চাউল ওজন হইল। তাহা চেনা মুটিয়ার মাথায় উঠিল। দোকানী নীলকান্তকে এক টাকার চারিখানা নোট দিয়া দিল। মুটিয়াকে বলিয়া দিল,—"বাবু দশ রোপেয়াকা নোট দেগা—লে আও গে।"

এ-রাস্তা, সে-রাস্তা, এ-গলি, সে-গলি ঘুরিয়া আগে আগে নীলকান্ত, পিছু পিছু মুটিয়া চাউল মাথায় করিয়া চলিল।—চৈতন সেন লেন, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, হিদারাম বাঁড়ুয্যের গলি।—"আউর্ কেত্তা দূর হায় বাবু ?"—"আউর থোড়াসে।"—গৌর দে লেন, চোরা বাজার, বৌবাজার ষ্ট্রীট............

বেলা তখন ছ'টা। বৌবাজার ষ্ট্রীটে তখন আফিস-ফেরতা কেরাণীবাবুর দলের স্রোত চলিয়াছে। সেই প্রবল জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ কুল হারাইয়া, মুটিয়া চাউলের বস্তা মাথায় করিয়া এ-দিক ও-দিক খুঁজিতে লাগিল—কুলের

আর সন্ধান মিলিল না। ফুটপাথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একবার সে চারিদিকে দৃষ্টি ছড়াইয়া ডাক দিল,—"আরে বাবু, কি ধার গৈলান্ হো ?"

পিছনের ভিড় তাহাকে ঠেলা দিল। এক জন কহিল,—"ওই উধার গৈলান হো। হট্‌-টো আভি,—রাস্তা ছোড়্‌কে দাঁড়াও!"

সে ধাক্কা খাইতে খাইতে, মাথার বস্তা ধরিয়া এক ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া যখন চারিদিকে চাহিয়া তাহার বাবুকে খুঁজিতে লাগিল, তখন তাহার বাবু সারপেনটাইন লেনে ঢুকিয়া পড়িয়া মনে মনে বলিল, 'মোড়লের পোর বউনিটা বোধ হচ্ছে যেন নেহাৎ মন্দ হবে না।'

২

বেলা প্রায় ৯টা।

দুই পয়সা দামের দুইটি নূতন মাটীর মালসা হাতে করিয়া নীলকান্ত বৌবাজারের একখানি প্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকানে প্রবেশ করিল ও তাহাতে এক টাকা মূল্যের দুই রকমের উৎকৃষ্ট সন্দেশ আট আনা হিসাবে লইয়া, ঝাড়নে বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল।

যেখানে বৌবাজার ষ্ট্রীট শিয়ালদ'র মোড়ে আসিয়া মিশিয়াছে,—তাহারই কাছাকাছি প্রকাণ্ড এক সুসজ্জিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। ভিতরে চাকর-বাকর, কর্ম্মচারিবর্গের কোলাহল, বহু লোক-সমাগম। নীলকান্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া গেল।

গৃহস্বামী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এই যে,—এস। তোমার সন্দেশের নমুনা এনেছ ? একটু ব'স।—ওরে কে আছিস ওখানে,—গোরা বাবুকে ডেকে দে।"

নীলকান্ত মনে মনে ভাবিতে লাগিল—গোরাবাবুর পূরা নামটা বোধ হয় গোরাকান্ত বা গোরাচাঁদ। নীলের পরীক্ষা তা'হলে আজ গোরাকে দিয়েই হ'বে। তুমি যদি একটা টাকার সমস্ত নমুনাই উদরসাৎ ক'রে ফেল, গোরাকান্ত, তা' হলেও নীলকান্তের দুঃখ নেই। কেন না, আসলে—যে নীল, সেই গোরা; যে তুমি—সেই আমি। দুই মূর্ত্তিতেই আজ আমি এখানে প্রকট। কিন্তু কোথায় আজ আমার সেই যমুনার তট, কোথায় সেই চিরশ্যাম বৃন্দাবন, কোথায় সেই ধবলী-শ্যামলী, কোথায় সেই চন্দ্রমুখী মানময়ী—

"ডাকছেন আমাকে ?" গোরাবাবু প্রবেশ করিলেন।

"হ্যাঁ। তোমার আইরিটোলা থেকে ফিরতে দেরী হবে কত ?"

"বারোটা-একটা।"

"তা হ'লে ফেরবার সময় রাধাবাজারের বসাক এণ্ড সন্সের ওখান হয়ে আস্‌বে। হার আর টায়রাটা বাকী রয়েছে,—নিয়ে আসবে।"

"আমাকে ত চেনে না, ফোনে একটু তা হ'লে ব'লে দিলে—"

"ফোনে বললে হবে না, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি"—বলিয়া গৃহকর্ত্তা চিঠির প্যাডখানি লইয়া কয়েক ছত্র লিখিলেন ও তাহা একখানি খামে পুরিয়া খামখানি আঁটিতে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ ভিতরের দিকে একটা ভারী দ্রব্য পড়িয়া যাইবার বিষম একটা শব্দ ও সঙ্গে-সঙ্গে লোকজনের চীৎকার ও কোলাহল শুনিয়া গৃহকর্ত্তা ও গোরাবাবু উভয়েই ব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন।

গৃহিণী সখ করিয়া তেতলার মুক্ত ছাদে প্রকাণ্ড এক পুঁইমাচা তুলিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রঙ্গীন কাপড়ের সামিয়ানায় সেই মাচা ঢাকিতে গিয়া, সেই বিপুলদেহ মাচা, দুই জন তদপেক্ষা বিপুলদেহ মজুর সহ হুড়মুড় করিয়া প্রচণ্ড শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

প্রায় মিনিট দশ বারো পরে কর্ত্তা ও গোরাবাবু ফিরিয়া আসিলেন। খামখানির উপর বসাক এণ্ড সন্সের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া কর্ত্তা তাহা গোরাবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন,—"ফেরবার সময় আনতেই চাও। তৈরী হয়ে আছে। দোকানটা চেন ত? ৫৪ নং;—লালবাজারের দিক দিয়ে ঢুকেই, সামনে।"

গোরাবাবু চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা নীলকান্তর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দেখি, এইবার তোমার সন্দেশের নমুনা বার কর। কি বিপদ! এক পয়সার পুঁইশাক আনলে খাবার লোক মেলে না, সেই পুঁইশাকের জন্যে তেতলার টঙের ওপর এক বিপর্য্যয় মাচা! পুঁইশাকটার ওপর দেখছি মেয়েদের কী যে একটা প্রবল প্রীতি!"

মালসার মধ্য হইতে সন্দেশ বাহির করিতে করিতে নীলকান্ত কহিল,—"বলেন কেন আর! প্রীতি ব'লে প্রীতি। সন্দেশ ফেলে রেখে পুঁই-ডাটা চিবোয় মশাই। অম্বলের অসুখের ওপর ঐ দ্রব্যটি নিত্য খেয়ে খেয়েই ত আমার পরিবার শেষটা মারাই গেল।—ওটা যা খেলেন, ও হ'ল আপনার কাঁচাগোল্লার পাক। আর এই হ'ল বাটাছানার তৈরী। আমাদের জৌগ্রামের এই হ'ল শ্রেষ্ঠ সন্দেশ।"

"নমুনা যা খাচ্চি, তা ভাল বটে।"

"নমুনা যা খাচ্চেন, এই জিনিষই আপনাকে দেবো; এর এক চুল এধার ওধার হবে না।—যে ক'টা এনেছি, এ ক'টা খেয়ে ফেলুন হুজুর; এ আর ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। এক গ্লাস জল,—ওরে বাবুকে এক গ্লাস—"

"সর্ব্বনাশ! এত সন্দেশ কি খেতে পারি, তা হ'লে ম'রে যেতে হবে। থাক্, সন্দেশ খাবার লোকের এখানে অভাব হবে না; একা ডাক্তারবাবুই—। যাক,—তা হ'লে দরটা—"

অতঃপর কিছুক্ষণ দর লইয়া কথা-কাটাকাটি হইবার পর বাবু পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া নীলকান্তর সম্মুখে রাখিলেন। নীলকান্ত তাহা ট্যাকস্থ করিয়া, বাবুর কথামত তাঁহার নাম বরাবর রসিদ লিখিল—'দুই মণ সন্দেশের মূল্য ৫০৲ মণ হিসাবে ১০০৲ টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে কোং ২৫৲ টাকা বায়নাস্বরূপ অগ্রিম পাইলাম। উক্ত দুই মণ সন্দেশের মধ্যে, ২১শে আষাঢ় তারিখে দশ সের এবং বাকী এক মণ ত্রিশ সের ২৪শে আষাঢ়, বেলা ১২টার মধ্যে সাপ্লাই দিব। ইতি, শ্রীকালাচাঁদ মোদক। সাং জৌগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

বাবু বলিলেন—"তোমার এখানকার ঠিকানাটাও লিখে দাও।"

তিলমাত্র না ভাবিয়া নীলকান্ত লিখিল—১১।২, চাউল পটী লেন।

"দেখো বাপু, ঠিক সময় যেন জিনিষ পাই। ২১শে দশ সের, আর ২৪শে পৌনে দু'মণ। শেষকালে যেন বিপদে পড়তে না হয়,—দেখো।"

"সে বিষয়ে আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"না, তুমি ঐ নীচে আর এক লাইন লিখে দাও যে, ধার্য্য দিনে ঠিক সময়মত মাল সরবরাহ না দিতে পারিলে—"

নীলকান্ত তটস্থ। লিখিতে লাগিল,—"ধার্য্যদিনে ঠিক সময়মত মাল সরবরাহ না দিতে পারিলে—

"বায়নার দ্বিগুণ পরিমিত টাকা—

"পরিমিত—টাকা—

"খেসারৎস্বরূপ দিতে বাধ্য রহিলাম।"

"দিতে বাধ্য রহিলাম।"

লেখা শেষ হইল। নমস্কার করিয়া নীলকান্ত বাহির হইয়া গেল। ফটকের কাছে গোরাবাবুকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"মশাই গো, বাবুর

কাছে মালসা ভরা থাকলো, একটু মিষ্ট মুখ করবেন মনে ক'রে; ভুলবেন না।"

গোরাবাবু তাহাকে কিছু বলিতে গিয়া দেখিল, নীলকান্ত খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে হাত-যোড় করিয়া তাহাকে বলিতেছে,—"একটু স্মরণ রাখবেন গরীবকে।"

সেই দিনই অপরাহ্ণ-বেলায়, বাবুর বসিবার ঘরে সকলে একত্র হইয়া তাহাকে ভীষণভাবে স্মরণ করা হইতে লাগিল।

বাবু কহিলেন,—"তা'হলে যখন চিঠিখানা লিখে রেখে তেতলায় মাচা দেখতে যাই, সেই ফাঁকে ও আসল চিঠিখানা বার ক'রে নিয়ে, সাদা কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পূরে, খামখানা এঁটে রেখেছিল। এখন আমার মনে হচ্ছে, খামখানা ত আমি এঁটে রেখে যাই নি, ঐ বেটাই—"

"পুলিসে তা হ'লে একটা খবর দেওয়া হোক।"

"বৃথা। সে লোক পুলিস-প্রুফ। ও নাম-টাম, ঠিকানা-টিকানা সবই ভুয়ো। ৮৷১০ ভরি সোণার দাম কি আজকাল কম! মজুরী নিয়ে সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি হবে।

"কি নাম বলেছিল?"

"কালাচাঁদ মোদক। ওঃ, আচ্ছা চোর বটে! বেটা আটগণ্ডা পয়সার সন্দেশ খাইয়ে পূরো চারশো টাকায় ঘা দিয়ে গেল। সন্দেশের বায়না তবু পঞ্চাশ চেয়েছিল, আমি ২৫৲ টাকার বেশী দিই নি।"

বৌবাজারের বড় বাড়ীতে যে সময় এইরূপ আলোচনা হইতেছে, সে সময় নীলকান্ত কালীঘাটে গঙ্গাতীরস্থ টীনের বাড়ীর একখানা ঘরের মধ্যে চিৎ হইয়া শুইয়া প্রফুল্লচিত্তে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

হরি, তোমায় ডাকবো যে, মোর এমন সময় নাই,
তুমি অধম-তারণ, সেই কারণে, মনে মনে ভরসা পাই ॥
প্রভাতবেলা, সন্দেশওলা
শ্রীকালাচাঁদ ময়রা,—
দ্বিপ্রহরে হ'লেন গোরা,
নিলেন হার আর টায়রা।
এখন সন্ধ্যাবেলা, কাজের ঠেলা, হেথা যাই কি সেথা যাই।

৩

নীলকান্ত দুই চারিদিন ঘোরা-ঘুরি করিয়া তাহার স্বোপার্জ্জিত হার ও টায়রা এক স্থানে বিক্রয় করিয়া ৩ শত ৬১ টাকা সঞ্চয় করিল। ইতিপূর্ব্বে সে তাহার ঘরে লাগাইবার জন্য বাজার হইতে ৵১০ পয়সা দামের একটা সাধারণ তালা কিনিয়াছিল এবং বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে তাহাই লাগাইয়া যাইত। এক্ষণে সে চৌদ্দ আনা দিয়া আরও একটি ভাল তালা কিনিয়া আনিল। তাহার পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া দয়াল রহস্যচ্ছলে কহিল—"কি গো, নীলকান্ত বাবু, ঘরে ডবল তালার ব্যবস্থা যে! হঠাৎ কিছু গুপ্ত ধন-টনের মালিক হলেন না কি ?"

নীলকান্ত হাসিয়া কহিল—"কি জানেন দাদা, আমি ত এখানে এক কাপড়ে এসেছি; ঘরে ধরতে গেলে আমার কিছুই নেই। বাড়ীওয়ালার মাদুর, সতরঞ্চ, বালিস, হরিকেন নিয়ে চালিয়ে দিচ্ছি। পয়সাকড়িও তেমন বিশেষ কিছুই নেই। থাকবার মধ্যে আমার কতকগুলো দরকারী কাগজ-পত্তর আছে, সেগুলোর জন্যেই একটু সাবধানের দরকার।"

দয়াল কহিল—"বেশ করেছেন। গেল পূজোর সময় আমার দু'-দু'খানা নতুন কাপড়, ভিক্ষে করতে এসে একটা ভিকিরী মিনষে, বেমালুম চুরি ক'রে নিয়ে গেল। দেখুন নীলকান্ত বাবু, আমার বিছানায় সেদিন একটি-বার ব'সে ছারপোকার দল দেখেছেন ত? ওৎ পেতে সব ঘাপ্‌টি মেরে আছে, একটু শুয়েছেন—কি ছেঁকে ধরেছে। তেমনই আজকাল রং-বেরংয়ের চোরের দল চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, একটু অসাবধান হয়েছেন কি বেমালুম চক্ষুদান!"

নীলকান্ত কহিল—"আর বলবেন না। আমার সে দিন কি হ'ল? হাওড়া ষ্টেশনে সবে ট্রেণ থেকে নেমে, একটু চা খাব, চায়ের দোকানে গিয়েছি; এইটুকু সময়ের মধ্যেই পকেট থেকে যা কিছু সব, একেবারে—ফাঁক! এমন সাংঘাতিক ফাঁক যে, চায়ের দাম দু'টো পয়সা পর্য্যন্ত বেটা রাখে নি!"

এই দয়াল লোকটি আজকালকার সাধারণ লোকের মত নহে। সে অত্যন্ত চরিত্রবান্ এবং ধর্ম্মভীরু। দেশে তাহার পুত্র-পরিবার আছে। সেখানে তাহাদের জন্য মাসে মাসে খরচ পাঠাইয়া দেয়; দিয়া—তাহার সামান্য উপার্জ্জনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই সে এখানে সংসারত্যাগী বৈরাগীর মত শুদ্ধ সরল জীবন যাপন করে।

পরের দিন রথযাত্রা। রথ দেখিতে গিয়া, খুব জলে ভিজিবার ফলে নীলকান্ত জ্বর করিয়া বসিল। পরদিন দুপুরবেলা সে আর হোটেলে খাইতে গেল না। অসুস্থ শরীরে চুপ করিয়া সতরঞ্চির উপর শুইয়া থাকিয়া সে তাহার নিজের কথা ভাবিতে লাগিল।—'এই ক'দিনের ভেতরেই ত প্রায় চারশো টাকার যোগাড় ক'রে ফেললুম। আড়াই শ' টাকা দিয়ে পালেদের কাছ থেকে জমীগুলো সব এইবার গিয়ে ছাড়িয়ে নেবো। ধরণীর

দোকানের 'উঠ্‌নো'র দেনা পঁচিশটে টাকা দিয়ে দেবো। ভেতর ভেতর বেটার ভারী অহঙ্কার! আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ কি না। বেটা মূখ্যু, পাড়াগেঁয়ে, জংলী, তিন পয়সার একখানা দোকান ক'রে ভারী একেবারে—"

"ভায়ার জ্বর এখন কেমন গো?"

দয়াল আসিয়া নীলকান্তের কপালে হাত দিয়া দেখিল।

"কি খেলে এ বেলা?"

"কিছুই খাইনি। একটু চা খেতে ভারী—"

"ইচ্ছে হচ্ছে? খাবে? দোকান থেকে দেবো এনে?"

দয়াল উঠিয়া গেল ও খানিক পরে দোকান হইতে একটা গেলাসে করিয়া চা আনিয়া নীলকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কাপটা কৈ?"

"ঐ যে সুটকেশটার পেছনে। থাক্ দাদা, কাপ দরকার হবে না, গেলাসেই গরম গরম খাই।" নীলকান্ত একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

"না—না, কাপ রয়েছে যখন—নীলকান্ত বাবু, এ সুটকেশটা দেশ থেকেই এনেছিলেন না? বড্ড ছোট। একখানি কাপড় আর একখানি গামছার বেশী আর কিছু ধরে না।—এত ভারী কেন গো? কি আছে এতে?"

একটু ব্যস্তভাবে নীলকান্ত কহিল—"তেঁতুলবীচি আছে, দাদা। একটা সাহেব জার্ম্মেণীতে চালান দেবে ব'লে নমুনা দেখতে চেয়েছে, তাই দেশ থেকে এনেছি।"

নিছক মিথ্যা কথা। সন্দেশের বায়না ও গহনা বিক্রয় প্রভৃতির দ্বারা সে যে কয়খানি নোট পাইয়াছিল, তাহার একখানিও সে ঘরে রাখিতে সাহস করে নাই, কি জানি, যদি আরশোলায় খেয়ে দেয়, ইঁদুরে কাটে, উই লাগে, কিম্বা দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া যায় বা পুড়িয়া যায়!

সেই জন্য সে নোট কয়খানা ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া সুটকেশটির মধ্যে রাখিয়াছে। চারি শ' টাকা,—ভারী ত একটু হইবেই ; প্রায় পাঁচ সের।

পরদিন বৈকালের দিকে নীলকান্তর খুব বেশী করিয়া জ্বর আসিল। সন্ধ্যার সময় দয়াল তাহার মাথার ধারে আসিয়া বসিল। কহিল—"কোন ভয় নেই, আমি একটু শান্তি-জপ করছি। কাল জ্বরের বেগ ক'মে যাবে এখন।"

আপদে-বিপদে পরোপকার করা দয়ালের স্বভাব। মিট্-মিটে হরিকেনের আলোয় ঘরের এক কোণে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া দয়াল জপ করিতে লাগিল। নীলকান্তর জ্বর তখন খুব প্রবল—একবারে বেহুঁস অবস্থা। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জপ করিতে করিতে দয়াল একবার তাহাকে ডাকিল। নীলকান্ত অঘোর-অচৈতন্য, কোন সাড়া আসিল না। তাহার পর আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া শান্তি-জপ করিয়া, দয়াল নীলকান্তর গা-ঠেলা দিয়া তুলিয়া একটু শান্তি-জল খাওয়াইয়া দিয়া কহিল—"আস্তে আস্তে একটিবার উঠে, দরজাটায় খিল লাগিয়ে দিন। আমি সজাগ রইলুম, রাত্রিতে দরকার হলে ডাকবেন।"

শেষ রাত্রিতে নীলকান্তর জ্বর ত্যাগ হইয়া গেল। তাহার পর একটু বেলাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতেই সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং চায়ের প্রত্যাশায় দয়ালকে ডাকিয়া, পয়সার জন্য সুটকেশ খুলিতেই মাথা ঘুরিয়া সে বসিয়া পড়িল। সুটকেশ—তাহার টাকা-ভরা সুটকেশ—তেঁতুলবীচিতে পূর্ণ! শুধু তেঁতুলবীচি—তেঁতুলবীচি—কাঁইবীচি! জার্ম্মেণীতে পাঠাবার জন্য নমুনার তেঁতুলবীচি! তাহা ছাড়া তন্মধ্যে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। অত বড় আকাশ, সবটা যেন ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় চাপিয়া পড়িল।

সেই সময় দয়াল স্নানান্তে অনুচ্চকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম আওড়াইতে আওড়াইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"কেমন ভায়া, গা এখন বেশ ঠাণ্ডা ?"

৪

আজ কয় দিন হইল নীলকান্ত পথ্য করিয়াছে। শরীর একটু সারিয়াছে, তবে মন সারে নাই। মনে সে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে, তাহা কত দিনে যে সারিবে, বলা যায় না। দুর্ব্বল দেহ ও পীড়িত মন লইয়া সে অধিকাংশ সময় তাহার ঘরখানির মধ্যেই থাকে। এক দিকে সে যে-পরিমাণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে তাহার হিংসা ও আক্রোশ ধরণীর উপরই গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিতেছে।

কিছুই ত ছিল না ওর। আধ পয়সার ঐ দোকানখানা উপলক্ষ্য ক'রে সংসারটাকে একেবারে ফিরিয়ে ফেল্লে। আহা, ভারি আমার ধার্ম্মিক গো! লেখা-পড়া জানে না, আকাট মুখ্যু, অসভ্য, জংলী, দুর্ব্বল, তাই বেটার খালি ভগবান্ ভগবান্, আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম। কোন বিষয়েই ত নিজের কোন ক্ষমতা নেই—তাই অক্ষমের ঐ জপ, তপ, ভগবান ছাড়া আর উপায় কি? বেটার পতন হবে কবে? তা হ'লে আমি বেশ ভাল ক'রে পূজো দি।

অপরাহ্ণবেলায় উত্তরের ধারের জানালার নীচে শয্যায় শুইয়া নীলকান্ত ধরণীর বিরুদ্ধে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আষাঢ়ের বেলা। দিনের কাজ সারিতে সূর্য্যদেবের তখনও বিলম্ব ছিল। উত্তর দিকের জানালাটা

সে কদাচিৎ খুলিত। সেখানে খানিকটা পোড়ো জমী। তারপর সম্মুখের ঐ বাড়ীটার খিড়কী। খিড়কীর দরজার বাহিরে এক স্থানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। তাহার উপর তরকারীর খোসা, ডিমের খোলা, আমের আঁটি, মাছের আঁশ, উনানের ছাই প্রভৃতির সঙ্গে একটা মাটীর তৈরী খেলার কেষ্ট ঠাকুর চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল। দিন কয়েক আগে, রথের মেলা হইতে উহাদের বাড়ীর একটা খুকী এই বড় পুতুলটা কিনিয়া আনিয়াছিল। পুতুলটা খুব বড়। হাত দুই উঁচু। পায়ের উপর পা রাখিয়া, বাঁকাশ্যাম —ত্রিভঙ্গিমঠাম। মাথায় খেংরাকাটি দিয়া বাঁধা একটু ময়ূরের পুচ্ছও গাঁথা ছিল, সেটা কোথায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পুতুলটিকে যে-সন্ধ্যায় ইহারা ঘরে আনে, সেই রাত্রিতেই ইহাদের বড় কর্ত্তার মশারিতে আগুন ধরিয়া যায়। হুলস্থূল ব্যাপার। অনেক কষ্টে সে আগুন নিভান হয়। তাহার পর মধ্যরাত্রি হইতেই আবার ঐ মেয়েটির জ্বর। তার পর, কয় দিন ভুগিয়া কাল সে মারা গিয়াছে। অপয়া পুতুলটাকে তাই ওরা দূর করিয়া খিড়কীর ঐ জঞ্জালের গাদায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার চূড়া খসিয়া গিয়াছে, টিনের তৈরী হাতের ছোট বাঁশীটা কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয়, বাঁকা পা-খানাও একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুপুরবেলাকার এক পসলা বৃষ্টিতে গায়ের নীল রং স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। খেলার ঠাকুর এখন তাই নিরুপায় হইয়া পড়ন্ত রৌদ্রের মধ্যে ঊর্দ্ধমুখে পড়িয়া রহিয়াছে।

'ঐ মাটীর পুতুলটা। ঐ অপয়া পুতুলটা। ওটা এই পটুয়াপাড়ার পোটোরাই গড়েছে। চার পয়সার জায়গায় চার আনা দাম নেবার ফিকিরে, আকারে পুতুলটাকে দু'হাত উঁচু ক'রে গ'ড়ে রথের মেলায় বিক্রী ক'রে গেছে। খানিকটা মাটী, একটু রং, একরত্তি ময়ূরের পালক-ছেঁড়া, একটা টীনের সরু নলের বাঁশী,—এই নিয়েই বংশীধারী বাঁকাশ্যাম। খুকী হয় ত

খেলার ঠাকুরঘর সাজাবে বলেই বায়না ধরেছিল, তাই ওদের বাড়ীর লোক পুতুলটা তাকে কিনে দিয়েছিল। তার পর তাকে ঘরে আনবার সঙ্গে-সঙ্গেই মশারিতে আগুন, খুকীর জ্বর, অবশেষে তার মৃত্যু। আর এই সবের জন্যে দায়ী হয়ে, খুকীর খেলার ঘরে দাঁড়িয়ে রইল তার এই চার আনা দামের খেলার পুতুলটা। এমন ক'রে সহজে মনকে বোঝাবার মত ত আর কিছু নেই। খুকীর বাপ-মা, খুড়া-জ্যেঠা, পিসী-ঠাকুরমা, তাই মৃত্যুর কারণটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে, হয় ত একটা নিঃশ্বাস সকলেই ফেলেছে। আর তা ফেলবার সঙ্গে-সঙ্গেই পুতুলটাকে তারা টান মেরে ঐখানে ফেলে দিয়ে গিয়েচে। দোষ ত আর কিছুরই নয়—ঐ অলুক্ষণে পুতুলটারই ত ষোল আনা অপরাধ! অপরাধীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। যে একটা জীবন নেবার শক্তি রাখে, সামান্য একটা প্রতিবাদ করবারও কিন্তু শক্তি তার নেই। সে নীরবে, খোঁড়া হয়ে, ক্ষত-বিক্ষত দেহে, জলে-রোদে, নোংরা স্তূপের উপর উর্দ্ধমুখে প'ড়ে আছে। হয় ত দিনে-দিনে তার উপর আরও কত জঞ্জাল গাদা হয়ে উঠবে। তার পর, এক দিন মিউনিসিপ্যালিটীর ধাঙ্গড় এসে তার ময়লা-ফেলা গাড়ীতে তাকে বোঝাই ক'রে নিয়ে কোথায় কোন্ ধাপার মাঠে ফেলে দিয়ে আসবে। সুতরাং ঐ অলুক্ষণে পুতুলটা দিয়ে জগতের কোন্ কাজ হ'তে পারে? একে দিয়ে খেলাঘর সাজানও ত চল্‌লো না।

মাটীর পুতুল;—তবে বেশ বড়। খোকাপুতুল, বাঘ, পাখী, গয়লা-বৌ নয়,—বংশীধারী বাঁকাশ্যাম। ধরণী হ'লে—'

নীলকান্ত চিন্তার মধ্যে গভীরভাবে ডুবিয়া গেল।

'আচ্ছা—আচ্ছা—এক কাজ করলে কেমন হয়?—অলুক্ষণে! হয় ত—তাই। পয় অ-পয় সব জিনিষেরই ত থাকতে পারে। অবিশ্বাসের

বা আশ্চর্য্যের কি আছে এতে। হয় ত ঐ মাটীর ঢেলাটার ভিতর এমন কিছু আছে, যাতে ক'রে সত্যই ওদের মশারিতে আগুন লেগেছে, খুকী ওদের মরেছে। হয় ত তা হ'লে ধরণীরও সব জিনিষে আগুন লাগতে পারে, তার গুষ্ঠীশুদ্ধ মরতে পারে।—হ'তে পারে—হ'তে পারে—সবই হতে পারে। আমাদের যে নারকেল গাছ ভিটেয় সয় না! পায়রা পুষে যে চক্কোত্তিরা উচ্ছন্ন গেল। অলুক্ষণে—অলুক্ষণে—হয় ত ঠিকই অলুক্ষণে! অপয়া পুতুল। ওরা তোমায় ফেলে দিয়েছে, আমি তোমাকে কুড়িয়ে নেবো।'

নীলকান্ত দুর্ব্বল দেহ লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ও গৃহের পশ্চাদ্দিক্ দিয়া ঘুরিয়া গিয়া আস্তাকুঁড় হইতে পুতুলটা তুলিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে সযত্নে রাখিয়া দিল।

৫

"ধরণীদা—ধরণীদা!"

গভীর রাত্রি। রাত্রি মেঘাবৃত, অন্ধকারময়। স্থানে স্থানে কোথাও হয় ত একটু হাল্কা মেঘের ফাঁকে অল্প একটু আবছা আলো আঁধার ধরণীর বক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল। ধরণীর বাড়ীর পাশে জঙ্গলে ভরা একটা ডোবার ধারে ক্রমাগত ব্যাং ডাকিয়া যাইতেছিল। একটু আগেই অনেক-ক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আবার এখনই হয়ত ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিবে।

পথের উপর চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে যে ঘরখানিতে ধরণী শয়ন করে, তাহারই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নীলকান্ত ডাকিল—"ধরণীদা—ধরণীদা!"

'উই আর সেভেন্'

দুই চারিবার ডাকিবার পর ধরণীর নিদ্রা ভাঙ্গিল। সে আলো জ্বালিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া কহিল,—"এত রাত্রিতে কেন রে?"

"ব'স ধরণীদা, সব বলছি।"

থপ্ করিয়া নীলকান্ত সেইখানে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।—"দেখ ধরণীদা, যদি কাউকে জগতের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—সে শুধু তোমাকে।"

"হ্যাঁ রে ভাই, বাড়ীতে কারও কোন অসুখ-টসুক করেনি ত? এত রাতে—"

"না, ধরণীদা।" অসুখ-বিসুখ আমার বাড়ীতে আর কি হয়? আমি যে তোমার ভাই,—আর বংশীবদন শ্রীহরি যে তোমার, ধরণীদা,—তোমার।" নীলকান্তের গলার স্বর বুজিয়া আসিবার মত হইল। ধরণী উৎসুক-চিত্তে নীলকান্তর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীলকান্ত পরশু গৃহে আসিয়াছে। সঙ্গে খেলার পুতুল—বাঁকাশ্যাম। নীলকান্ত কহিতে লাগিল—"ধরণীদা, হঠাৎ বাড়ী ফিরে এলুম কেন, তা জান? কেউ জানে না। ভেবেছিলুম কা'কেও আর জানাব না। কিন্তু জানাতে হ'ল। এই দেখ ধরণীদা, সে কথা বলবার আগেই সারা গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠেছে!"

ধরণী অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নীলকান্ত রোমাঞ্চিত-দেহে কহিয়া যাইতে লাগিল। সে যাহা কহিল, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সে কলিকাতায় গিয়াই একস্থানে কাজে লাগিয়াছিল। শনিবার শেষ রাত্রিতে সে হঠাৎ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার সম্মুখে ব্রজের বাঁকা, কালো সখা, ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়াইয়া তাহাকে কহিতেছে—'তোদের গ্রামের ভ্যাঁটার-বিলের পূর্ব্ব পাড়ের উপরকার জঙ্গলে বড় কদমগাছের নীচে শিয়াকুল

কাঁটার ঝোপের ভিতর আমি প'ড়ে রয়েছি। আর রোদে-বৃষ্টিতে আমি থাকতে পাচ্ছি না, আমায় এখান থেকে কালই তুলে নিয়ে যাবি।' নীলকান্ত পরদিনই কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু কাল রাত্রিতেই আবার সে স্বপ্ন দেখে, বাঁকাশ্যাম তাহাকে কহিতেছে—'তোর এখানে কিন্তু আমি থাকব না, নীলু। আমার সাধ ধরণীর ঘরে থাকবো। সেইখানে আমায় রেখে আয়।' নীলকান্ত কিন্তু ঠাকুরের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া ধরণীর গৃহে আর তাঁহাকে দিয়া আসে নাই, স্বগৃহেই রাখিয়াছিল। আজ রাত্রিতেই আবার ঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন,—'তুই যদি এই দণ্ডেই ধরণীর ঘরে আমায় দিয়ে না আসিস্, তা হ'লে তে-রাত্তির মধ্যে তোদের সকলকে মরতে হবে।' তাই আজ এই মধ্যরাত্রিতে স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই সে তাহার ধরণীদার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া ধরণী বিস্ময় ও আবেগভরে কহিল,—"বলিস্ কি রে ভাই! বাঁকাশ্যাম আমার কোথায়—কোথায়? এনেছিস তাঁকে?"

"তুমি বোসো ধরণীদা, আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসছি।"

তাঁকে আনিতে নীলকান্ত দ্রুতগতি আপন গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

৬

ধরণী বাঁকাশ্যামকে গভীর ভক্তিসহকারে তাহার পূজার ঘরে ছোট একখানা জলচৌকির উপর স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যূষে নদীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া ফিরিবার সময় সে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনে। সেই ফুল দিয়া মনোমত করিয়া সে নিত্য বাঁকাশ্যামকে সাজায়, তাঁহার ছোট্ট বাঁশীটাকে চন্দন-চর্চ্চিত করে, তুলসীপত্রে তাঁহার পায়ের নূপুর ঢাকিয়া দেয়।

নূপুর, শিখি-পাখা, বংশী—সমস্ত ধরণী করিয়া দিয়াছে। পীতধড়ায়, মোহনচূড়ায় ঠাকুরের এখন রূপ ফিরিয়া গিয়াছে। তুলসী ও পুষ্প-চন্দনে সজ্জিত হইয়া মাটীর পুতুলকে যেন সত্যকারের ঠাকুরের মত দেখায়। কোন কোনদিন সন্ধ্যায় আরতির পূর্ব্বে ধরণীর বিধবা কন্যা রাখালদাসীর রচিত পুষ্পমাল্যের গোছা বাঁকাশ্যামের গলায় ঝুলাইয়া দিয়া, ধরণী অতৃপ্তনয়নে গোলকবিহারী অনাদি শ্রীহরির রূপমাধুরী দর্শন করিয়া পুলকে মুগ্ধ হইয়া উঠে।

প্রতিষ্ঠা করা ঠাকুর নয়, তবু ধরণী তাঁর সেবায় একবিন্দু ত্রুটি হইতে দেয় না। প্রত্যহ পূজান্তে ধরণী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলে—'তুমি আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ, তুমি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, তুমি দীনবন্ধু। দীনের ঘরে এসেছ যখন, তখন তোমার সেবার ত্রুটি হ'লে, দোষ নিও না, ঠাকুর! চরণের ছায়া যখন দিয়েছ, বাঁকাশ্যাম, তখন আর চরণ-ছাড়া ক'রো না। আমি জানি, ডাকলে তুমি না এসে পার না। অনেক দিন থেকে তোমায় ডাকছি, নারায়ণ, আর কি তুমি না এসে থাকতে পার? বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম—নন্দদুলাল—রাধারমণ—গোপীবল্লভ!' বলিতে বলিতে ধরণীর সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ হইয়া, যেন সে কেমন এক-রকম হইয়া যায়, তাহার সর্ব্বদেহ শিথিল হইয়া পড়ে।

এ দিকে নীলকান্ত আশায়-নিরাশায় কোন রকমে দিনের পর দিন কাটাইয়া যাইতেছে। প্রত্যহই সে ধরণীর একটা কোন অমঙ্গল, একটা কিছু অঘটনের আশা করিয়া থাকে,—হয় ধরণীর নিজের কিম্বা তাহার পুত্র-কন্যার মৃত্যু, অথবা তাহার গৃহদাহ, অথবা আরও কিছু ভয়ানক! মুখে সে কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদাই তাহার বিষের ঝড় বহিতে থাকে।—'হে অপয়া পুতুল! যে অজ্ঞাত জড়শক্তি বলে তুমি মশারিতে

আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলে, মেয়েটিকে তার বাপ-মার বাড়ী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছ, সেই শক্তিতে তুমি ধরণীকে ধরণী থেকে সরিয়ে দাও, তার সর্ব্বনাশ কর। তার দোকান, তার ঘর-দোর, তার ধানের মরাই পুড়িয়ে ছাই ক'রে দাও। তার পঞ্চাশ বিঘে লাখরাজের উপর বেহারের ভূমিকম্প লাগিয়ে সেগুলাকে একেবারে রসাতলে পাঠিয়ে দাও!'

অথচ এই উভয় জ্ঞাতি-ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইলে, ধরণী তাহার স্বভাব-সরল, শুদ্ধ প্রাণের আবেগে বিভোর হইয়া বলে—"ভাই রে, তোর ঋণ আমি কখনও শুধতে পারবো না। তো হতেই আমি শ্রীহরিকে ঘরে আনতে পারলুম। তোর মত পরমাত্মীয় আমার আর কেউ নেই, নীলু।" নীলকান্ত বলে—"ধরণীদা', যদি কা'কেও নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি, সে শুধু তোমাকে। তোমার জন্তে প্রাণ দেওয়াও আমি বেশী ব'লে মনে করি না। তুমি একজন পরম ভক্ত। ভক্তের ঘরে হরি কি না এসে থাকতে পারেন?"

এমনই ভাবে এক দিকে এক জনের হর্ষে উৎসাহে, আর এক জনের আশায়-ঔৎসুক্যে, দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। অন্য দিকে অপরা পুতুল দিব্য আরামে থাকিয়া, ফুলে-চন্দনে-মালায়-পূজায়-ভোগে-রাগে নিত্য সেবা পাইতে লাগিল।

ক্রমে নীলকান্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। 'এত দেরী হচ্ছে কেন? সে মেয়েটির বেলা ত এক দিনেই কাজ হয়েছিল। এ যে সাত দিন কেটে গেল, তবু—। হ'তে পারে—হ'তে পারে। আয়োজনটা হয় ত একটু বেশী রকমের হচ্ছে। সে ছিল একটা ছোট্ট একরত্তি মেয়ে, তাই তারবেলা এক দিনেই হয়েছিল, আর এ হ'ল ধরণীর ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ, এর সবগুলোর উপর কাজ হতে একটু দেরী হবে বৈ কি। কিন্তু যদি না হয়? না-ও ত

হ'তে পারে। হয় ত পুতুলটার পয়-অপয় ব'লে কিছুই নেই। মেয়েটা হয় ত এমনিই মারা গিয়েছিল; আগুন হয় ত এমনিই লেগেছিল। যদি তাই হয়, তা হ'লে ত সবই বৃথা হ'ল। না—না, তা হ'তে পারে না। অপয়া পুতুলই হবে। তবে কাজ একটু ভারি ব'লে হয় ত একটু দেরী হচ্ছে।'

এমনই যখন অবস্থা, তখন গভীর তৃপ্তির সঙ্গে নীলকান্ত এক দিন শুনিল —ধরণীর খুব জ্বর হইয়াছে।

ব্যাস্!—অপয়া পুতুল! সার্থক তুমি, সার্থক তোমাকে আমার নিয়ে আসা!

নীলকান্ত অন্তরের উল্লাস চাপিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি বিষাদ-মলিন মুখে ধরণীর গৃহে ধরণীকে দেখিতে ছুটিল।

গিয়া দেখিল, জ্বর সামান্যই। মনে ভাবিল—সামান্যতেই সুরু, তার পর হয়ত আজ রাত্রির মধ্যেই সব শেষ, যেমন সেই খুকীটির হইয়াছিল। মুখে সে কহিল—"ধরণীদা, ডাক্তারকে একবার ডাকিয়ে একটু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলে হ'ত না? তোমার অসুখ-বিসুখ করলে আমার যে বড় ভাবনা হয়।"

ধরণী কহিল—"ভাই রে, বাঁকাশ্যামের কৃপা পেয়েছি, আমার আর ওষুধ লাগবে না।" কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধরণী কহিল,—"তাই ত, আজ যে উঠে তাঁর পূজোটা করতে পাল্লুম না! নীলু, যে ক'টা দিন আমি উঠতে না পারি, একবার ক'রে এসে পূজোটি ক'রে দিয়ে যাস, দাদা আমার!"

নীলু একটুখানি ঘাড় নাড়িল। যেন এই সামান্য কথার প্রতি তাহার বিশেষ কোন মনোযোগ নাই; এ ত সে আসিবেই। কিন্তু তাহার সমস্ত মন যে তাহার দাদার এই অসুখের চিন্তাতেই ক্লিষ্ট।

পরদিনও ধরণী উঠিতে পারিল না। বাঁকাশ্যামের পূজার জন্য এ বাড়ী হইতে নীলকান্তকে ডাকিতে গেলে, তাহার স্ত্রী, স্বামীর শিখানমত

কহিল—"কোথায় বিশেষ কাজে হঠাৎ যেতে হয়েছে, এ বেলা আর বাড়ী আসবে না।"

খবর শুনিয়া ধরণী ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শয্যায় শুইয়া সে ছট্-ফট্ করিতে লাগিল। ধরণীর বড় মেয়ে রেবতী আসিয়া কহিল—"বাবা, হাবুল পারবে না? ওর ত পৈতে হয়েছে।"

হাবুল ধরণীর পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার বয়স মাত্র নয় কি দশ বৎসর। সে যেমন চঞ্চল, তেমনই দুষ্ট। সকালে এমন সময়টা ত তাকে কোন দিনই বাড়ীতে পাওয়া যায় না। মাঠে, বাগানে, নদীর ধারে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, বিলের পাড়ে, শীতলাতলায়, কাজরীর সাঁকোর বাগানে, সাঁওতালপাড়ায়—কত যায়গায় তাহার কত কাজ! কিন্তু আজ কেন যে সে এমন সময়টায়, গোয়ালের এক কোণে চুপ করিয়া একখানা বাঁখারি হাতে লইয়া বসিয়া আছে, তাহা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই।

বড়দিদির আদেশে হাবুল স্নান করিয়া আসিল, কাপড় ছাড়িল। রেবতী শ্বশুরবাড়ী হইতে কয়দিন হইল আসিয়াছে। বাটীর মধ্যে হাবুল তাহাকেই একটু মানে-গণে।

"কিছু খাস্নি ত, হেব্লো? ঠিক ক'রে বল্।"

"না দিদি, সত্যি বলছি।"

কিন্তু তাহার কথায় রেবতীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। সে যে কিছু না খেয়ে এত বেলা পর্য্যন্ত আছে—যাক্ গে; প্রতিষ্ঠা-করা ঠাকুর ত আর নয়। শুধু বাবার মনের তুষ্টি।

"দেখ্ হেব্লো, পূজো-টুজো কিছু তোকে করতে হবে না। গায়ত্রীর মন্ত্র জানিস ত?"

"হ্যাঁ গো, বোল্‌বো শুন্‌বে? ভূভূ——"

"আচ্ছা, আর বলতে—হবে না। গোটা দু'চ্চার তুলসীপাতা হাতে নিয়ে দশবার গায়ত্রী জপ ক'রে ঐ পায়েসের বাটীর মধ্যে সেগুলো ফেলে দিয়ে ভোগ দিবি—বুঝলি?"

"বুঝেছি গো—বুঝেছি, তোমায় আর বলতে হবে না।"

হাবুল তাহার জীবনে এত বড় একটা কাজের ভার এই প্রথম পাইল। সুতরাং সে দিগ্বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বিতবক্ষে পূজার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

৭

"ও ঠাকুর, খাও গো!"

পূজার ঘর। মাটীর পুতুল বাঁকাশ্যাম ত্রিভঙ্গিমঠামে বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে তুলসীর পাতা দেওয়া পায়েসের ছোট বাটিটা হাতে করিয়া, হাবুল হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধা-সাধি করিতেছে—"খাও গো—শীগগীর খাও।"

হাবুলের আর দেরী সহিতেছে না। সাঁওতালপাড়ায় আজ একটু পরে মোরগের লড়াই হবে। ভাত খাইয়াই সেখানে তাহার আজ যাওয়া চাই-ই। ঠাকুরের ভোগ লইয়াই আজ সে মহামুস্কিলে পড়িয়াছে। হয় ত তাহার ভাগ্যে আজ মোরগের লড়াই দেখা ঘটে কি না।

"ও বাঁকাশ্যাম, খাও না শীগ্‌গীর ক'রে; মোরগের লড়াই হয়ে যাবে যে! খাও—খাও। দোহাই তোমার খাও। আঃ! কি মুস্কিলেই,

পড়লুম! খাও না, ও বাঁকাশ্যাম!—আচ্ছা, সবটা না খাও, একটুখানি খাও। তোমার দু'টি পায়ে চারটি গড় করি খাও বাঁকাশ্যাম।"

বাঁকাশ্যাম কিন্তু খাইল না, বাঁকা হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। হাবুল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

"হেই বাঁকাশ্যাম, তোমার পায়ে পড়ি, একটুখানি খাও। তুমি না খেলে বাবা আর বড়দি' আমায় আর রাখবে না। খাও—খাও, তোমার খাওয়া না হ'লে আমারও ভাত খাওয়া হবে না। আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। খাও শীগ্‌গীর। না খেলে জোর ক'রে খাওয়াব কিন্তু; খাবে কি না বল?"

মাটীর পুতুল যেন ঈষৎ নড়িয়া উঠিল।

"খাও, লক্ষীটি—খাও। আমি আর দেরী করতে পাচ্ছি না। বাটি ধ'রে থেকে আমার হাত ভ'রে এল যে। তোমার পায়ে পড়ি, খাও শীগ্‌গীর বাঁকাশ্যাম।"

বাঁকাশ্যাম হাত বাড়াইয়া হাবুলের হাত হইতে পায়েসের বাটী লইল।

* * * *

ধরণীর বাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। লোকে লোকারণ্য।

বাঁকাশ্যাম নিজের হাতে পায়েসের বাটি লইয়া পায়েস খাইয়াছে। ভোগ দিতে হাবুলের অসম্ভব দেরী দেখিয়া রেবতী ঠাকুরঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়া দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠে—"ওগো সব ছুটে এস, ওগো সব দেখবে এস। ঠাকুর পায়েস খাচ্ছেন।" তাহার সেই অস্বাভাবিক চীৎকারে সকলে ছুটিয়া আসিয়া দরজা ঠেলিয়া দেখে, বাঁকা-

শ্যামের হাত হইতে পায়েসের বাটি পড়িয়া গিয়াছে আর তাঁর মুখ ও বুক বাহিয়া পায়েস গড়াইয়া তাঁহার বাঁকা পায়ের উপর পড়িতেছে।

একবাড়ী লোক। সমস্ত পাড়াটা ভাঙ্গিয়া ধরণীর বাড়ী জড় হইয়াছে। ধরণীর স্ত্রী হাবুলকে কোলে করিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে এক ধারে বসিয়া রহিয়াছে। হাবুল বলিতেছে,—"অর্দ্ধেক খেয়েছে, এমন সময় বড়দি' গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, তাই ঠাকুর পায়েসের বাটি হাত থেকে ফেলে দিলে; আমি তার কি করব?"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ধরণীর বৃহৎ অঙ্গন সমস্ত গাঁয়ের লোকে ভরিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র ঠাকুরঘর লোকের ভিড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। ধরণীর কিন্তু কোন দিকেই লক্ষ্য নাই; মুখে তাহার কথা নাই, দেহে তাহার যেন সাড় নাই। সে বাঁকাশ্যামের পায়ের তলায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া কত প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহই কোন উত্তর পাইতেছে না। সে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। শুধু মাঝে মাঝে অত্যন্ত অস্ফুটে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে—"বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম—বাঁকাশ্যাম।"

নীলকান্ত কোথায়? ধরণীর ভাই নীলু?

সে ভিড়ের মধ্যে একবার আসিয়া উঁকি দিয়া চুপি চুপি দেখিয়া গিয়াছে এবং দেখিবার পর হইতেই সর্ব্ববিষয়েই তাহার মেজাজ যেন আজ অতি মাত্রায় বিগড়াইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে শুধু-শুধু-খানিকটা ঝগড়া করিল, স্ত্রীকে গালাগালি করিল; বোষ্টুমপাড়ার বুড়া বৈরাগী একতারা লইয়া গান করিতে আসিলে, দাঁত-মুখ খিচাইয়া তাহাকে দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বুড়া বৈরাগী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া পুরুতের বাড়ীতে গিয়া তাহার অসমাপ্ত গান শেষ করিল—

যে তোমারে ঘৃণা-ভরে,
পাথর ব'লে ব্যঙ্গ করে,
হিন্দু হোয়ে অহিন্দু সে, তার দর্প কর চুর।
শিখাও তারে কাণে ধ'রে—
'ভণ্ড ওরে—পাপী ওরে,
বিশ্বাসেতে কৃষ্ণ মিলে—তর্কে বহু দূর।'

———

দলা-দলি

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ঠাকুরদাদাদের মুখে সে-কালের কাহিনী শুনিতাম। আজ ঠাকুরদাদারা গত হইয়াছেন। আজ বয়সের 'ক্লাশ-প্রমোসান্' পাইয়া আমরাই তাঁদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি। তাঁদের তখনকার 'এ-কাল'টা, আমাদের এখন 'সে-কাল' হইয়া পড়িয়াছে। তখন ভুলেও ভাবি নাই যে, 'সে-কালের' কাহিনী শোনাইবার গর্ব্ব আমরাও কোন দিন লাভ করিব। লাভ যখন করিয়াছি আর শ্রোতারও অভাব নাই, তখন বলিবার আনন্দ ত্যাগ করি কেন।

বর্ত্তমানের তুলনায়, মানুষের মনে, অতীতের প্রভাবটাই বেশী। তার মাধুর্য্যও বেশী। অতীতের যা-কিছু সবই যেন ভাল, সবই যেন বড়। 'আছে'র অপেক্ষা 'ছিল'র মূল্যটা একটু বেশী করিয়া দেওয়াই আমাদের স্বভাব। রামের এ ছেলেটি খুবই ভাল বটে, কিন্তু যে ছেলেটি মারা গিয়াছে, সেটি ছিল রত্ন। হরির আগেকার বৌ, এ-বৌয়ের তুলনায় অপ্সরা ছিল! আগেকার দিনে গাছে কুল ফলতো,—ঠিক এক একটা বেলের মত। সেকালের লোকের রোগই হইত না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতীতের কথা বলিতে তাই এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত তৃপ্তি।

খুব যে বেশীদিনের কথা, তা' নয়। বড় জোর বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হইবে। আমার বয়স তখন চৌদ্দ কি পনর। রাজু ঘোষালের পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়া তখন আমি পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়িতে যাই।

গ্রামের নাম—সুন্দরপুর। এখন যেখানে হুগলী জেলার ত্রিশবিঘার জঙ্গল, সুন্দরপুর উহারই কাছাকাছি। সুন্দরপুর আমার পিত্রালয় নয়,

মাতুলালয়। বাল্যকালটা মাতুলালয়েই কাটিয়াছে। বড় সুখেই কাটিয়াছে। আজ পরিণত বয়সে সুন্দরপুরের সেই সব স্মৃতি মাঝে মাঝে যখন কর্ম্মহীন অন্তরে আসিয়া পড়ে, তখন অন্তরটা যেন কোন বিস্মৃতপ্রায় সুখ-স্বপ্ন মধ্যে নাচিয়া বেড়ায়। যেন সে আজিকার এ পৃথিবী নয়। সে যেন এ পৃথিবীর বাহিরে কোথাও কোন সুন্দর দেশ, যার আকাশ ছিল আলাদা, বাতাস ছিল আলাদা, মাটি ছিল আলাদা। যার পথ, ঘাট, বন, জঙ্গল, বাড়ী, ঘর-দোর, মানুষ—সবই ছিল আমার একান্ত পরিচিত, একান্ত প্রিয়। এখানকার সঙ্গে সে-সবের কিছুরই মিল নেই। সে 'আমাকে'ও আর আমার মধ্যে এখন খুঁজিয়া পাই না। পাই কচিৎ কখন কখন, যখন কোন কর্ম্মহীন দিনে, বর্ত্তমানের কোলাহলময় জীবনের ক্ষণিক অবকাশে সেইসব দিনের মধুর কথা মনের মধ্যে অপূর্ব্ব হইয়া অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠে, শুধু তখনই।

সেই সুন্দরপুর আজও আছে। আজও গাঁয়ের উত্তর-পশ্চিম কোণ বেড়িয়া সেই অ-নামা অপরিসর নদীটার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। তবে তাতে বর্ষাকাল ভিন্ন আর জল থাকে না। আর জল যখন থাকে, তখনও তার ঘাটে ঘাটে পূর্ব্বের মত আর মেয়েদের সে ভীড় দেখা যায় না। নদীর সে ঘাটগুলো অ-ঘাট হইয়া জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সেই মন্দিরটি বুকে করিয়া আজও সর্ব্বমঙ্গলাতলা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু সেদিনের সে শ্রীও নাই, সে মাধুর্য্যও নাই, সে জম্-জমানিও নাই। তাই সন্দেহ হয়, প্রতিমার মধ্যে আসল মা-টি আছেন কি না। সম্ভবতঃ নাই। সর্ব্বমঙ্গলময়ী মা যখন ছিলেন, তখন গাঁয়ের সর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গল ছিল। আজ মন্দির মধ্যে বোধ হয় তিনি শ্মশানকালীরূপে বিরাজিতা।

কিন্তু বর্ত্তমান লইয়া বলিতে গেলে ত' অনেক কিছুই বলিতে হয়। তার দরকার নাই। অতীতের সেই সুন্দরপুরের সুখের স্মৃতি, যাহা অন্তরকে আনন্দ দান করে, যাহা মনের উপর একটা মদির স্বপ্নের জাল বিস্তার করে, তাহার কথাই বলি।

গাঁয়ের আধখানা জুড়িয়া—উত্তরপাড়া। বাকী আধখানার মধ্যে কুলীনপাড়া, দক্ষিণপাড়া, মধ্যেরপাড়া, দৈবকপাড়া। দুইপাড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থলে সর্ব্বমঙ্গলাতলা। সেইখানেই উত্তর দিক্ ঘেঁসিয়া হাটতলা। সোম, শুক্রবার তথায় হাট বসে। আশে-পাশে ময়রার দোকান, মুদীখানা, সেকরার দোকান, কাপড়ের দোকান প্রভৃতি।

ফাল্গুন মাস। আর কয়েকটা দিন বাদেই আমাদের পাড়ার 'বারোয়ারী' হইবে। আমাদের পাড়া মানে উত্তরপাড়া বাদে যে কয়টি পাড়া, তাহাই। উত্তরপাড়ার সঙ্গে এ পাড়ার মনের মিল নাই,—অনেক দিনের দলা-দলি। চৈত্রের প্রথম দিকে এ পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেলেই আবার বৈশাখের মাঝা-মাঝি ও-পাড়ার বারোয়ারী। সুতরাং এখন থেকেই গ্রামে একটা উৎসাহ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উভয় পাড়ার মধ্যে দলা-দলি থাকায় রেষা-রেষিতে আনন্দ-উৎসাহটা যেন সকলের আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আমাদের পাড়ার বারোয়ারীর যাঁরা সব পাণ্ডা, তাঁরা সর্ব্বসময়েই এ-সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা, শলা-পরামর্শ করিতেছেন। কিরূপ আতস-বাজী পোড়ান হইবে; কয় কুড়ি 'বোমা'র অর্ডার দেওয়া হইবে; কিরূপ উদ্যোগ—আয়োজন, সমারোহ আদি করা হইবে; কাহার 'দল' গাওয়ান হইবে; ভিন্ গাঁ হইতে কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে;—এই সব।

'উই আর সেভেন্'

সর্ব্বমঙ্গলাতলায় নিবারণ ঘোষের দোকানেই সকাল-বিকাল পাণ্ডাদের কমিটী বসে। কমিটীতে আমাদের ছেলেদের দলের দু'চারজন উপস্থিত থাকি।

সেদিন কানু ঘোষাল তামাক খাইতে খাইতে কহিল,—এবার যাত্রাটা কিন্তু ভাল দেখেই বায়না করতে হবে। 'বৌ কুণ্ডু' না পাওয়া যায়, ত' 'শশী অধিকারী'। যুগল ভট্‌চার্য্যি কহিল,—যদি 'মতি রায়'কে মেলাতে পারি তা হলে আর কা'রেও নয়। বলিয়া যে যুগল ভট্‌চার্য্যি আসনপিড়ী হইয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে উবু হইয়া বসিয়া কানু ঘোষালের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া জোরে জোরে টান দিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু 'সুখ-টান' দিবার মহেন্দ্রক্ষণেই দেখিল যে হুঁকার শীর্ষদেশে কলিকা নাই। পশ্চাৎ হইতে অন্নদা পাল নিঃসাড়ে উহা হস্তগত করিয়া, হস্তদ্বয়ের যোগা-যোগেই নীরবে তাহার ধূম-সেবায় লাগিয়া গিয়াছে। কানু ঘোষাল নিবারণের উদ্দেশে কহিল,—হ্যাঁরে নেবা, বলি—বারোয়ারীর সময়টাতেও একটা করে কল্‌কে বাবা! এ সময়টা দুটো করে কল্‌কের ব্যবস্থা কর্! নিবারণ কহিল, দু'টো ছেড়ে পাঁচটা করে করতে পারি, বারোয়ারীর চাঁদাটা কিছু কম করে ধর দেখি, ঠাকুর!

সর্ব্বমঙ্গলাতলায় মায়ের মন্দির পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। সম্মুখে, মন্দিরের পশ্চিমাংশে সুপ্রসার উন্মুক্ত স্থান। এক পার্শ্বে বহুকালের প্রাচীন বট ও অশ্বত্থ গাছ। প্রতি বৎসর এই স্থানেই দুই পাড়ার বারোয়ারীর উৎসব সম্পন্ন হয়। এবারেও স্থানটিকে দিন থাকিতে সু-পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ঐ উচ্চ বট ও অশ্বত্থ গাছের শীর্ষদেশে 'লগি'-বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে রক্তবর্ণের নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ হইতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই সুন্দরপুরের বারোয়ারী আনন্দের বৈজয়ন্তী।

এ পাড়ায় যাহাদের যাহাদের বাঁশ-ঝাড় আছে, তাহাদের সেই সব বাঁশ-ঝাড় হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁশ কাটিয়া আনিয়া এক জায়গায় জড় করা হইয়াছে, মেরাপ নির্ম্মাণ, আসর সাজান, পূজাস্থান, রন্ধনের চালা,—বাঁশের কাজেই ত' সব। সুতরাং বর্ত্তমানে সকলে বাঁশ লইয়াই ব্যস্ত। ছেলে-ছোকরার দলকে—অর্থাৎ বিশ বছর হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স যাদের, তাদের—সেই সব বাঁশের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কেহ কেহ বাঁশ চিরিতেছে, কেহ বা বাঁখারি প্রস্তুত করিতেছে, কেহ শলা বানাইতেছে, কেহ ঐগুলি চাঁচিয়া ছুলিয়া পরিষ্কার করিতেছে, আবার কেহ-বা মাপ-মত খুঁটি কাটিতেছে। সকালবেলা এগারটা সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত এই সব কাজ করিয়া সকলে ঘরে যায়। তারপর আবার সন্ধ্যার পর হইতে কাজে লাগে। এই সময়টিই মধুর। সারাদিনের প্রখর রৌদ্র এবং উত্তাপের পর এই সময়টা যখন মৃদুমন্দ বসন্তের বাতাস বহিতে থাকে, তখন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার আলোকে সকলে মহা উৎসাহে ও আনন্দে পরস্পর গল্প করিতে করিতে কাজ করিতে থাকে। আমরা একেবারেই নাবালক। এই 'জুনিয়ার' দলেও যোগদানের অধিকার আমাদের ছিল না। তবে ভরসা ছিল, আর কয়েক বৎসর পরেই যখন সাবালকত্বের জয়টীকা আমাদের কপালে অঙ্কিত হইবে, তখন আমরাও এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ হইব।

গ্রামের অধিবাসীরা তখন সকলেই গ্রামে থাকিতেন। গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাত্র দুইজন বিদেশে থাকিতেন। একজন, আমারই মাতামহ। তিনি মেদিনীপুর জেলার ডাক্তারী করিতেন। অপরজন—সারখেল বাড়ীর কুঞ্জমামা। তিনি ভাগলপুর জেলায় কোন এক নীলকুঠীতে কিছু

একটা কাজ করিতেন। এঁরা দু'জনেই এই সময়টা একবার করিয়া দেশে আসিতেন ; আর একবার আসিতেন—পূজার সময়।

বারোয়ারীর দিন কয়েক থাকিতে কুঞ্জমামা আসিয়া পড়িলেন। বাটীতে পদার্পণ করিয়াই, তিনি নিবারণ ঘোষের দোকানে আবির্ভাব হইয়া সোল্লাসে কহিলেন,—

'ইউ'—নিবারণ ঘোষ,
'হোয়্যার্ ইজ দি' ঘোষ ?

এমন সময় কানু ঘোষাল আসিয়া কহিল, সকলে মিলে তোর কথাই ভাবছিলুম। যাক্, এসে পড়েছিস্ তা হলে। নীলকুঠী থেকে সঙ্গে কিছু নীল-টীল এনেছিস্ কি ?

নীল ? চাই না কি ? হ্যাঁ—তা'—

ওরে, 'হ্যাঁ—তা' নয় ? খানিক নীলের এবার দরকার পড়বে। উত্তর পাড়ার গন্‌শা মুকুজ্যেকে আর বিরু রায়কে এবার নীল-বাঁদর সাজাতে হবে কি না ; তাই খানিক নীলের দরকার। বুঝিছিস্ ত ?—পশ্চাৎ হইতে যুগল ভট্‌চার্য্যি হঠাৎ আসিয়া কহিল, দু'ছড়া পাকা মর্ত্তমান কলারও ত তা'হলে দরকার হবে ; সেটা নিবারণকে ফরমাস্ দেওয়া যাক। নিবারণ হাত দুটো কপালে ঠেকাইয়া কহিল, তোমাদের বামুন-দেবতার ও-সব কথায় আর আমায় জড়িও না ঠাকুর ; পাপের তা' হলে আর অন্ত থাকবে না।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে আর একজনের কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া গেল—মোটা খাদের নারীকণ্ঠ। কণ্ঠের অধিকারিণী সিধু জেলেনী, অনুযোগের স্বরে সম্বোধন করিয়া উঠিল, বলি হ্যাঁ গা কুঞ্জ ঠাকুরপো !

কুঞ্জমামা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সিধু কহিল,—আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি ! দুগগো পুজোর সময়ে আমার মাছের পাঁচটা পয়সা না দিয়েই তুমি চলে

গেলে ?—কুঞ্জমামা প্রথমটা চম্‌কাইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সিধুর কথার উত্তরে কহিল, বাপ্‌রে ! সেই পাঁচটা পয়সার কথা এই ছ'মাসেও তুই ভুলিস্ নি ?

ভুললে চলবে কি করে বল ? পাঁচ পাঁচটা পয়সা ! এবার দিয়ে দিও। —বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার সরস্বতী পূজার পর দিন মামার সঙ্গে চারি পাঁচদিনের জন্য মাসীর বাড়ী গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া, আমাদের ক্লাসের সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ রে, গাঁয়ের খবর কি বল্। সুরো মোটামুটি খবর জানাইয়া শেষে কহিল, আর একটি খবর হচ্ছে, সিধু জেলেনী মারা গিয়েছে।

মাইরি ?

মাইরি। তার কলেরা হয়েছিল।

শুনিয়া একটু দুঃখ হইল। লোকটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। তাহার বাড়ীর উঠানে একটা কুল গাছ ছিল। সেই গাছের কুল, যেমন বড় তেমন মিষ্টি। সিধু কাহাকেও সে কুলে হাত দিতে দিত না ; কিন্তু আমাকে কেন জানি না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কুল খাইতে দিত। সেই জন্য তার মৃত্যুসংবাদে মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল।

ইহার পরদিন নদীর ও-পারে দাই-পাড়াতে আমাদের প্রজা নন্দ বষ্টুমের কাছে খাজনা আনিতে দিদিমা আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিবার সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া নদীর সাঁকোর কাছে আসিয়া পড়িলাম, সাঁকোর বাঁ-ধারেই মড়া-শ্মশান। এখানটাতে সকলেরই একটু গা ছম্-ছম্ করে। আমারও করিতে লাগিল। শ্মশানটা পার হইয়া যাইতে পারিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হইয়া এ পারে আসিতেই—সর্ব্বনাশ ! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! সিধু জেলেনী নদীর ঘাটে নামিয়া পা ধুইতেছে !

'উই আর সেভেন্'

ছুট্! ছুট্!—কোন দিকে না চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। পড়ি কি মরি, সে জ্ঞান তখন আর নাই। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ী ঢুকিয়াই একেবারে রান্নাঘরে। মা বলিল, ছুটে এলি যে? দিদিমা কহিল,—কি রে, কি হয়েছে? আমি কহিলাম,—সিধু জেলেনীকে দেখলুম মা! মাইরি বলছি!—মা কহিল,—তা'র আর হয়েছে কি। গাঁয়ের লোক, দেখবি না কেন? দিদিমা বলিল,—তার সঙ্গে বুঝি কিছু করেছিস্, তাই ছুটে পালিয়ে এলি।

কি বল্‌ছ গো! সে ত মরে গেছে!

তোর মুণ্ডু!—বলিয়া দিদিমা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিতে গেল আর মা অনর্গল হাসিতে লাগিল।

তখন বুঝিতে পারা গেল, সুরোর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পরে জানা গেল, তাহাকে কুল দেয় নাই বলিয়া, তাহার উপর সুরোর খুব রাগ হইয়াছিল। তাই সে—

যা'ক্; সিধুর মরার ব্যাপারটা তখন বেশ বোঝা গেল।

কুঞ্জ মামা কানু ঘোষালকে কহিল,—হোয়্যার ইজ দি মোষ?—অর্থাৎ বারোয়ারীতে প্রতি বৎসরই মহিষ বলিদান হইত; সেই মহিষের কথা। কানু ঘোষাল কহিল,—মোষের সন্ধান দু'এক জায়গায় পেয়েছি, দু'এক দিনের মধ্যেই যেখান থেকে হোক যোগাড় করে ফেলতে হবে।

পূজার দিন-দুই-চার থাকিতে, কয়জন চাঁই মিলিয়া এক দিন সকাল সকাল আহারাদির পর মহিষ কিনিতে বাহির হইল। তখন আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে এত মহিষের আমদানী হয় নাই। এত—দূরের কথা, একটি মহিষ যোগাড় করিতেও বহু স্থানে ঘোরা-ঘুরি করিতে হইত। এখন ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা। দেশের—অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের এই

অঞ্চলটায় এখন অসংখ্য মহিষের আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব। মাঝে মাঝে বড় বড় শিং-ওয়ালা মানুষ-মহিষের উৎপাতেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এই সকল মনুষ্য-মহিষ—। কিন্তু সে সব কথা এখানে নয়; যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

দিন দুই পরে বলিদানের মহিষ আসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে, যিনি মহিষ বলিদান করিবেন, তিনিও আসিয়া পড়িলেন। তিনি অন্য কেহ নহেন,—দাদামশাই। বারোয়ারীর মহিষ বলিদানের ভার ছিল তাঁহারই উপর। তাঁহার গায়ে ছিল যেমন অসীম শক্তি, মনে ছিল তেমনি পূর্ণ আনন্দ উৎসাহ। তবুও, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার বয়স ৫২।৫৩ বৎসরের কম নহে; অর্থাৎ যে-বয়সে এখন আমাদের মহিষ দূরের কথা, একটা মশা মারিতেও হাতের কব্জীতে ব্যথা লাগে। তখনকার দিনে দেশ এবং দেশের লোক আধুনিক মতে অবনত ছিল, সে কথা যেমন ঠিক, তেমনি তাদের শক্তি, সামর্থ্য, আয়ু, আনন্দ এখনকার তুলনায় যে অনেক বেশী ছিল তাহাও ঠিক। তখন আহার-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যও ছিল, লোকে আহার করিতে পারিতও বেশী এবং তাহা হজম করিবার শক্তিও সকলের ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাতঃকালীন জল-খাবার অনেক স্থলেই ছিল—কাঁচা চাউল জলে ভিজানো, আর তাহার সহিত আখের গুড়। আমাদের পাড়ার প্রসন্ন স্বর্ণকার আধসের-আড়াইপো ভিজা চাউল গুড়-সংযোগে প্রত্যহ 'ব্রেক্‌ফাষ্ট' করিয়া তাহার দিনের কাজে বসিত। তাহার পর মধ্যাহ্নের আহার হইত বেলা ১টা ১॥০টার সময়। সে অন্ন-ব্যঞ্জনের পরিমাণ এখনকার একটা লোকের চারি গুণ। শুধু প্রসন্নই নয়, সকলেই তখন এই রকম খাইতে পারিত।

আমাদের, অর্থাৎ কি না ছেলেদের পক্ষে বারোয়ারীর দুইটি বিষয়ে লোভ থাকিত। একটি মহিষ-বলি, অপরটি যাত্রা।

আশায়, আনন্দে, উৎসাহে, কয়দিন কাটিয়া যাইবার পর বারোয়ারী পূজার দিন সমাগত হইল। আসল পূজা কিরূপ হইল, কাহার পূজা হইল, কে পূজা করিল, সে-সব সংবাদের জন্য আমাদের আগ্রহও নাই, আমরা তাহা রাখিও না। আমাদের লক্ষ্য—মহিষ-বলি। যত ছেলের দল সেই বেচারা মহিষকে ঘিরিয়া সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া। মহিষ-বলির জন্যই আনন্দ: আবার বলিদান দেখিয়া, সেই মহিষের জন্যই অন্তরে একটা নিদারুণ ব্যথা পাওয়া, বালক-হৃদয়ের অপূর্ব্ব মনোবৃত্তির অপূর্ব্ব পরিচয়!

যাহা হউক, বিপুল হর্ষ ও কলরবের মধ্যে মহিষ-বলি হইয়া গেল।

এইবার 'যাত্রা'। সে 'বৌ-কুণ্ডু'র দলও পাওয়া যায় নাই, 'শশী অধিকারী'র দলও পাওয়া যায় নাই। 'মতি রায়ে'র ত নয়-ই। বায়না হইয়াছিল—'পাতিরাম নস্করে'র দল। দল নূতন হইলেও অল্পদিনের ভিতরেই নাম করিয়াছে। কিন্তু পাতিরামই হউক, সীতারামই হউক, দল আসিয়া পড়িলে যে হয়। আমরা সব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। যদি দল না আসে, তাহা হইলে পৃথিবী থাক বা যাক, ভূমিকম্পই হোক আর জগত রসাতলেই গমন করুক, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। দলের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এক মাইল পর্য্যন্ত পথে আমরা 'ডাক' বসাইয়া দিলাম।

অবশেষে আসিয়া পড়িল। আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া, আমাদের অন্তর এবং চক্ষুকে তৃপ্ত করিয়া আসিয়া পড়িল—দুইখানা মাল-পত্র বোঝাই গো-যান। তখন সকলের মধ্যে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। এ দুইখানা গাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছিল—যাত্রাদলের সাজ-পোষাকের বড় বড় কাঠের বাক্সগুলি। তাই দেখিয়াই আমাদের কি আনন্দ! সে আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হইল—যখন কিছু পরে যাত্রাওয়ালারা সদলবলে

আসিয়া পড়িল এবং ঘোষালদের চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তাহাদের ডেরা পাতিল।

পাছে গোড়া হইতে যাত্রা শোনাটা না ঘটে, সেজন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছুটিয়া বাড়ী গিয়া, তাড়াতাড়ি আধ-পেটা আহার করিয়া ভোজনের হাঙ্গামাটা মিটাইয়া আসিলাম। কিন্তু যাত্রা যখন বসিল, তখন মধ্য-রাত্র। তখন সেই সন্ধ্যাবেলার আধ-পেটা আহার জীর্ণ হইয়া গিয়া ক্ষুধাতে উদর অঝোর-ঝারায় কাঁদিতেছে। কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আর উপায় এবং সাধ্য কোনটিই নাই। উপায় নাই এইজন্য যে, উঠিয়া গেলে, আসরের পুরোভাগে বসিবার স্থানটি বে-দখল হইয়া যাইবে; আর শক্তি নাই এইজন্য যে, প্রথমেই না কি গদা-হাতে ভীমের আগমন। সুতরাং সে-অবস্থায় সেই মধ্যরাত্রে আকাশে সূর্য্যের উদয় হওয়াও যদিচ সম্ভব হইতে পারে, আমাদের আসর ত্যাগ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, যাইবই বা কোথা? বাড়ীতে ত কেহই নাই। মা, দিদিমা, মামীমারা—সকলেই ত যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। বাড়ী ত তালা-বন্ধ।

যাহা হউক, পেটের খোরাক না জুটিলেও, চক্ষু-কর্ণের খুবই জুটিল। সমস্ত রাত এবং পরের দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত, সেই অর্দ্ধ-হস্ত পরিমিত স্থানে, একাসনে, একই ভাবে, পরমোৎসাহে যাত্রা শুনিতে শুনিতে কাটিয়া গেল।

যাহা হউক, এ-পাড়ার বারোয়ারী ত সাঙ্গ হইল; এইবার ও-পাড়ার বারোয়ারী। ও-পাড়ার বারোয়ারীতে মহিষ-বলির বিধি নাই। তবে 'যাত্রা' নিশ্চয়ই আছে। সুবিখ্যাত সাঁতরা কোম্পানীর দলকে উহারা বায়না করিয়াছিল। এ-পাড়ার সঙ্গে 'টেক্কা' দিয়া ও-পাড়ার 'গাওনা' হইল।

পালা হইল—কর্ণ-বধ। গাওনা শেষ হইলে শোনা গেল, ও-পাড়ার পাণ্ডারা মিলিয়া আসরে একটা 'সং'য়ের পালা দিবে। এ-পাড়ায় 'পালা' হইয়াছিল—'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'; উহারা সং দিবে—'বৌদিদির হস্তধারণ'। দিলও তাই। ব্যাপারটার গুহ্য কথা এই যে, এ-পাড়ার বিপত্নীক দু'কড়ি গাঙুলি নাকি তাঁর বিধবা জ্যেষ্ঠাভ্রাতৃ-বধূর সহিত কি-সব নিন্দনীয় কাণ্ড করিয়া গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। সেই সব কথা লইয়াই এই 'সং'য়ের পালা রচিত। ইহার মধ্যে আরও একটু মজা ছিল। আসল দু'কড়ি গাঙুলীর বয়স ছিল বছর চল্লিশ। কিন্তু পালায় দু'কড়ি গাঙুলী সাজিয়াছিল—ভুতো; ভুতোর বয়স বছর দশেক। আর গাঙুলীর 'বৌদিদি' সাজিয়াছিল, বাগ্দীদের পঞ্চা। তাহার বয়স বছর চৌদ্দ পনর হইবে। বিধবা বৌদির একটি পনর বছরের ছেলে ছিল—অমূল্য। অমূল্য আমাদের সঙ্গে পড়িত। 'অমূল্য' সাজিয়াছিল—কালী মুকুজ্যে। তাঁর বয়স হবে—বছর ষাট্। তখন ব্যাপারটা মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝি নাই। এখন বুঝিতেছি 'সং'য়ের সেই পালাটা সব দিক দিয়াই রীতিমত 'সং'-ই হইয়াছিল। আর 'দলা-দলি' উপলক্ষ্য করিয়া সেকালের সমাজ-শাসনটা এমন প্রবল ছিল যে, কাহারও কোন অন্যায় করিয়া পার পাবার যো ছিল না। সুতরাং 'দলা-দলি'র মন্দের দিকটাও যেমন ছিল, ভালর দিকটাও তেমনি ছিল। পালার একখানা গানের অধিকাংশ এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু আজকালকার দিনে তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না। কিছু অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট হইয়া পড়ে। তবে তাহার প্রথম দু'টি লাইন বলা যাইতে পারে। তাহা এই :—

"কড়ি হে তোমার নিমগাছেতে মিষ্টি মধুর চাক্।
দেখো—যেন যায় না উড়ে, কোরো কিছু তুক্-তাক্॥

গাঙ্গুলী-বাড়ীর উঠানে খুব বড় একটা নিমগাছে একটা মৌচাক হইয়াছিল। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নী সর্ব্বাগ্রে নিমগাছটার গোড়ায় বাঁ পায়ের তিনটা লাথি মারিত। এটা একটা মেয়েলী 'তুক্'। এতে না কি মৌমাছিরা চাকের মধু খাইয়া অন্যত্র উড়িয়া যায় না।

ঐ গানখানা গয়লাদের ভুতো গাহিত। ভুতোর গলাটা ছিল ভারি মিষ্টি। এই গানখানা তার মুখে কি সুন্দরই যে লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, ধরিতে গেলে, ও-পাড়ারই জিত হইল। ও-পাড়ার উপর এ-পাড়ার আক্রোশের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। ও-পাড়া-ওলাদের জব্দ করিতে এ-পাড়া-ওলারা নানা রকম মতলব আঁটিতে লাগিল। কানু ঘোষাল বলিল, এ সব ঐ বীরু রায়েরই মতলব। কুঞ্জকে বললুম, খানিকটা নীল সঙ্গে করে আন্তে হয়। তা হলে মুখে মাখিয়ে দিয়ে ওকে নীল-বাঁদর সাজানো যেত। যুগল ভট্‌চার্য্যি কহিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যস্ত হ'য়ো না; এর বিহিত আমি করব এখন। এমন জব্দ ওদের করবো যে বাছাধনরা——

কিন্তু আর জব্দ করিবার দরকার হইল না। একটা চরম অশুভের মধ্য দিয়া এই গ্রামের পরম শুভ ঘটিয়া গেল; গ্রামের বহুকালের দলা-দলি মিটিয়া গেল। এ-পাড়া ও-পাড়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন-বদ্ধ হইল।

চৈত্র-বৈশাখের এই সময়টায় আশ-পাশের গ্রামসকলে প্রায়ই 'কলেরা' লাগিত। তবে সুন্দরপুরে কখনো বড় একটা এ ভয় হয় নাই। এবার ও-পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেলে, বাগ্দীপাড়ার কার্ত্তিক বাগ্দীর ছোট মেয়েটি হঠাৎ ঐ রোগে আক্রান্ত হইল এবং ঘণ্টাকতক মধ্যেই মারা গেল। তারপর নারাণ বাগ্দীর মায়ের হইল। সে-ও মারা গেল। আরও দু'চার জনের হইল। তাহাদের মধ্যে দুইজন সারিয়া উঠিল, দুইজন মরিল।

ইহার পরই দেখিতে-দেখিতে রোগ বাগ্দীপাড়া হইতে সারা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। আতঙ্কে সকলে কাঁপিয়া উঠিল। কখন্ কাহার ঘরে বিপদ আসিয়া পড়ে, কিছুরই স্থির নাই। দুর্ভাবনায় ও ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। পাশের গ্রামের রজনী ডাক্তারই এ তল্লাটে নাম-করা ডাক্তার, তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, শুধু একটা কাজ যদি দুর্দিনে আপনারা করেন, তাহোলে ভগবানের দয়ায়, আর আমার প্রাণপণ চেষ্টায় কোন বিপদই আপনাদের হবে না। আপনারা দু'পাড়া এক হোন্, এই আমার ইচ্ছা।

অবশেষে তাহাই হইল। রজনী ডাক্তারের মধ্যস্থতায় দুই পাড়া এক হইল। বহুদিন হইতে যে দলা-দলি কিছুতেই যায় নাই, আজ তাহা এমনিভাবে মিটিয়া গেল। বিপদ ও অমঙ্গলের মধ্য দিয়া এক মহা-মঙ্গল সাধিত হইল।

রজনী ডাক্তারেরই যে চেষ্টা, আর ভগবানেরই যে দয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্যই ভগবানের দয়া। ক্রমে ক্রমে ভীষণ ব্যাধি দুই পাড়ার অনেককেই যদিও আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু একটি মাত্র বলি ছাড়া, আর সে দ্বিতীয় বলি পায় নাই। অবশ্য প্রথম আমলে বাগ্দীপাড়ার কথা স্বতন্ত্র। একটি প্রাণ যা' গিয়াছিল, তা' যাওয়ারই দরকার ছিল। ভগবান সবদিক্ দিয়া সুবিচার করিয়া বুঝি সুন্দরপুরে এবার এই ভীষণ মহামারী আনিয়াছিলেন। মরিয়া গিয়াছিল—দু'কড়ি গাঙ্গুলীর সেই বিধবা ভ্রাতৃজায়া। সে ত মরিল না, সে মরিয়া বাঁচিল। এ কথা ত ছেলে বয়সে বুঝি নাই, আজ বুড়া বয়সে বুঝিতেছি।

যাক, সুন্দরপুর শান্ত হইল। সব দিক্ দিয়াই শান্ত। এই উপলক্ষে সারা গ্রামে আনন্দ-উল্লাসের বন্যা বহিয়া গেল। স্থির হইল, বহুকাল দুই পাড়ার লোক একসঙ্গে বসিয়া আহারাদি করে নাই, সুতরাং এক ভোজের

আয়োজন—অতীব প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শ পাকা হইয়া গেল। দাদামহাশয়কে আসিবার জন্ত সবিস্তারে এক পত্র দেওয়া হইল। আর কুঞ্জমামাকে করা হইল—টেলিগ্রাম। নহিলে সাহেব এত তাড়াতাড়ি হয়ত পুনরায় ছুটি মঞ্জুর করিবেন না। টেলিগ্রামে কুঞ্জমামীরই জবানীতে লেখা হইল, 'Aunt died. Come at once'। কিন্তু কুঞ্জমামার সংসারে কুঞ্জমামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোকই আর ছিল না। বলা বাহুল্য, মামাকে গোপনে খামের মধ্যে এক পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক, দাদামশাইও আসিয়া পড়িলেন, কুঞ্জমামাও আসিয়া পড়িলেন। সর্ব্বমঙ্গলাতলায় তখন ও-পাড়ার বারোয়ারীর 'ম্যারাপ' বাঁধাই ছিল। অমনি থাকে। তবে এ-পাড়ার বারোয়ারী হইয়া গেলে, এ-পাড়ার লোকেরা তাঁহাদের 'ম্যারাপ' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কারণ, তাঁহাদের গড়া 'ম্যারাপ' শত্রুপক্ষ ব্যবহার করিবে? 'ম্যারাপ'-তলার আশে-পাশে, চতুর্দ্দিকে আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইল, ঘাস চাঁচিয়া ফেলা হইল। সব স্থানটা গোবর দিয়া নিকান হইল। বহুদিনের রাগা-রাগি, দ্বেষাদ্বেষি, বিবাদের পর, এইখানেই মায়ের সম্মুখে মহা-মিলনের মহাভোজ সম্পন্ন হইবে।

ভোজের দিন সকলের কী আনন্দ! সকলে যখন খাইতে বসিয়াছে, তখন ও-পাড়ার গণেশ মুকুজ্যে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কোমরে হাত দিয়া, নাচের ভঙ্গীতে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—

'কড়ি হে, তোমার নিম গাছেতে মিষ্টি মধুর চাক।
দেখ যেন যায় না উড়ে—কোরো কিছু তুক-তাক্॥'

হাসির একটা উচ্চ শব্দে 'ম্যারাপ' ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহসা কানু ঘোষাল পিছন হইতে বীরু রায়ের সমস্ত মুখখানাতে নীল রং মাখাইয়া দিয়া, বক্তৃতার ভঙ্গিমায় কহিল, বৎস! নীলপদ্ম

আনিবার ভার যে তোমার উপর !—আবার একটা হাসির উচ্চরোলে সমস্ত স্থান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবার বাটি আসিবার সময় কুঞ্জমামা খানিকটা নীল সঙ্গে করিয়া আনিতে ভোলে নাই।

বড়দের আনন্দ-ভোজ হইয়া গেলে, আমরা ছোটরা পরামর্শ করিলাম, আমরাও একদিন সকলে মিলিয়া 'ফিষ্ট' করিব। সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া গেল,—খিচুড়ী, আলু ভাজা, ডিম আর হালুয়া। আমি দিব চা'ল, শশী দিবে দা'ল, যতীন—ঘি, অবিনাশ—হাঁসের ডিম, আর সুরো দেবে—সুজি, চিনি, তেল।

যথাদিনে 'চৈতন পুকুরে'র পাড়ের আম-বাগানটার মধ্যে মহানন্দে, মহা উৎসাহে আমাদের 'ফিষ্ট' সমাধা হইল। আহারান্তে 'চৈতন পুকুরে'র ঘাটে নামিয়া সকলে হাত-মুখ ধুইতেছি, পিছন হইতে মোটা খাদের নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, বাগানে সব 'চড়ি-ভাতি' হল বুঝি ? ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, সিধু জেলেনী। তাহাকে আজিকার এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের দেখাটা টপ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। সুরেনকে বলিলাম, সুরো, সিধি মরেছে না বেঁছে আচে, ঠিক করে বল ভাই।

সেই একদিন আর এই একদিন! সেদিনের সেই সব স্মৃতি লইয়াই যেন বাকী কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকি। বাল্যকালের স্মৃতি,—এ যে স্বপ্নে ভরা, মধুমাখা। এর আর তুলনা নাই। গত জীবন মানুষের অমূল্য সম্পত্তি। তাই, এক এক সময় উচ্ছ্বাসে, আবেগে, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে—

ফিরে এস স্বপ্নময়
মধুভরা গত দিনগুলি।
ফিরে এস স্রোত ঠেলে
আবার উজানে পাল তুলি'।

———

বৃন্দাবনের পথে

মহিম বরাবরই ছিল একটু সাধু-সন্ন্যাসী ঘেঁসা। জপ-তপ, পূজা-আহ্নিকের উপর চিরকাল তা'র বিশেষ ঝোঁক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ও জিনিষটা তা'র মধ্যে বিশেষভাবেই বিকাশ পায়। ইদানীং তাহার সহিত দেখা হইলেই, সে অনেক বড় বড় সব কথা বলে, যেমনঃ—'অসারে খলু সংসারে'—, 'অনিত্য জগতে সত্যই এক মাত্র—', 'মায়া মোহ', 'কামিনী-কাঞ্চন', 'ভক্তিতেই ভগবান্'—ইত্যাদি। অনেক দিন পরে সেদিন আসিয়া সে বলিল,—সুরেশ, আর কেন? কিছু পারের কড়ি জমাতে হবে ত এইবার! বৃথা কাজে কালহরণ করে লাভ কি?

আমি আমার আংটীর পাথরখানা কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিলাম, নিশ্চয়ই।

মহিম কহিল,—চল, আর মিথ্যা জঞ্জাল ঘেঁটে কি হবে? বেলা যে পড়ে এল!

আমি বলিলাম,—আসুক পড়ে; সামনে জ্যোছনা রাত্রি, একেবারে অন্ধকার হ'বে না।—তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—তা ভাল; কোথাও গিয়ে পারের কড়ি কিছু জমানো যা'ক। কোথায় যাবে?

—বৃন্দাবন।

তখন দু'জনে পরামর্শটা পাকা করিয়া ফেলিলাম। দু'জনের ভিতরের উদ্দেশ্য অবশ্য এক নয়। মহিম নিশ্চয়ই পারের কড়ি জমাতেই যাইতেছে, কিন্তু আমার যাইবার আসল কারণ তা নয়। আমি যাইতেছি বিরক্ত

হইয়া। যাহাকে বলে 'বিরক্ত সন্ন্যাসী'—আমি তাই। বছর চৌদ্দ-পনর আগে সংসারে দিব্য সুখে-শান্তিতে ছিলাম। গৃহে যা'কিছু আহারীয় দ্রব্য আনা হইত তাহার চৌদ্দ আনা ভাগই আমার ভোগে লাগিত; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নির্ব্বিবাদে নিদ্রা দিতে পারিতাম, ঘরের জিনিষ-পত্র যেখানে যাহা রাখিতাম, সেইখানেই তাহা পাইতাম। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে, নাতি-নাতিনীদের এক বিরাট রেজিমেণ্টের দল কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া এমন জুড়িয়া বসিয়াছে যে, তাহাদের কলরবে ঘুমাতেও পাই না, কিছু খাইতেও পাই না। যদি পঞ্চাশটা আম কিনিয়া আনি, খাবার সময় দেখি, আমার ভাগে পড়িয়াছে—একখানা 'চাক্‌লা' আর একটি আঁটি মাত্র। কমলা লেবু আমি একটু ভালবাসি; কিন্তু আশা মিটাইয়া যে একদিন খাইব, সে উপায় নাই। সেদিন এক কুড়ি কিনিয়া আনিয়া, গৃহিণীকে বলিয়া দিলাম, আমার জন্য যেন অন্ততঃ ছুইটা রাখা হয়: কিন্তু খাইতে বসিয়া পাতে দেখিলাম—পাঁচ কোয়া! রাগে এবং দুঃখে তাহা পাতের এক ধারে ঠেলিয়া রাখিলাম। গৃহিণী বুঝিতে পারিয়া বলিল,—কি করব বল? শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে এতগুলি মুখ, সকলকেই ত' ছু চার কোয়া ক'রে দিতে হবে।

সব চেয়ে বেশী এবং বড় দুঃখ—এখন গৃহের আসল বস্তুটিরই অর্থাৎ গৃহিণীরই আর সাক্ষাৎ পাই না। সারা দিনের মধ্যে হয় ত কোনোদিন একটিবার তাঁহার দেখা মিলে, হয় ত বা তাহাও মিলে না। আগের মত তাঁহার সঙ্গে যে দুটা গল্প বা রসালাপ করিব, সে সুখটুকুও গিয়াছে। আগে মস্ত বড় বাড়ী ছিল; তার ভিতরেও তাঁর সঙ্গে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার দেখা সাক্ষাৎ হইত। আর এখন সেই বাড়ী চার ভাগ হইয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে; তবু এই ক্ষুদ্র একরতি বাড়ীতে হয় ত দিনান্তে একটিবারও

তাঁর সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ ঘটে না। এই বিপুল রেজিমেণ্টের পিছনেই তাঁহার সমস্ত সময় এবং শক্তি চলিয়া যায়। মোট কথা, এই ভূত-প্রেতের দল আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিল।

এবং এই দুঃখেই আমার বৃন্দাবন যাত্রা। মনে ভাবিলাম, সেই ভাল; আমার পক্ষে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস করাই ভাল। সেখানে গিয়া বৃন্দাবনের বনে বনে বেড়াইব, যমুনার ধারে গিয়া বসিয়া থাকিব আর প্রাণ ভরিয়া ঘুমাইব। সুতরাং সেই ভাল।

মহিমকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সেখানে গিয়ে খাব কি?

মহিম বলিল,—যে উদর একবেলা দু'টি শাকান্নে পূরণ হ'তে পারে, তার জন্যে চিন্তার আর কি আছে?

আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, ছেলেদের উপায়ের টাকায় ত সংসার চলে; আমার 'পেন্‌সন্'টার মুখ চেয়ে ত কেউ থাকে না; সুতরাং ঐ থেকেই দিব্যি সুখে-শান্তিতে খেয়ে-দেয়ে সেখানে—

মহিমের সঙ্গে কথা পাকা হইয়া গেল। বাড়ীর কাহাকেও কিছু বলা হইবে না। ছেলেরা সব যে-যাহার আফিস-আদালতে বাহির হইয়া গেলে পর, বুধবার দ্বিপ্রহরে মহিম চুপি চুপি আসিবে এবং মাত্র একখানি কাপড় ও গামছা লইয়া তদ্দণ্ডেই আমি মহিমের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িব।

বুধবার যথাসময়ে মহিম আসিয়া পড়িল। আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম, তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

রসা রোড আর রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে আসিয়া উভয়ে ট্রামে উঠিতে যাইব, এমন সময়ে হঠাৎ মহিম পিছনের দিকে একবার চাহিয়া ছুটিল। ভাবিলাম, বৈরাগ্য হঠাৎ শিকায় উঠিল না কি?

কিন্তু তাহা নয়। সে খানিকটা ছুটিয়া গিয়া একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি-সব কথা সুরু করিয়া দিয়াছে। ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া আমিও তথায় গেলাম। গিয়া শুনিলাম স্ত্রীলোটিকে মহিম বলিতেছে,—মেয়ে-লোক হয়ে বাছা, জুচ্চুরির ব্যবসা ধরেছ! সেদিন বিধবার বেশে স্বামী মারা গেছে বলে চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে গেলে, আর আজ দেখচি দিব্যি সধবার বেশ!—

স্ত্রীলোকটির পরণে লাল কস্তা-পাড় সাড়ী, সীঁথিতে সিঁন্দুর, হাতে নোয়া। সে মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, বাবা তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ, তোমার কাছে আর কিছু লুকোবো না। পেটের জ্বালা, বাবা, পেটের জ্বালা! এই পোড়া পেটের জন্মেই বিধবা হোতে হয়, আবার সধবা হোতে হয়! কি করি বাবা! আগে সকলের সঙ্গে ভিক্ষেয় বেরোতাম; তাতে সকলের আমার ওপর আড়ি, হিংসে। তাই আর ওদের সঙ্গে বেরোনো ছেড়ে দিয়েছি। দিয়ে—

দিয়ে, এই জুচ্চুরি ধরেছ! ও পুঁটুলিতে কি? কারো বাড়ী থেকে নিশ্চয়ই কাপড়-চোপড় চুরি করে এনেছ!

দোহাই বাবা, চোর আমি নই। ওতে আমার থান কাপড়খানা বাঁধা আছে। যে পাড়ায় এখন যাচ্ছি, সেখানে সদবার বেশে যাওয়া চলবে না। এক জায়গায় এ কাপড়খানা ছেড়ে, মাথার সিঁদুরটা মুছে—

সেখানে বুঝি সধবা সেজে গিয়েছিলে এর আগে? আজকে স্বামী মরেছে বলে কেঁদে গিয়ে পড়বে? সে ছেলেটি কই, সেদিন যাকে নিয়ে আমার বাড়ী গেছলে? এ-ত দেখছি তোমার সে ছেলে নয়।

সেটিও আমার নয়, এটিও আমার নয়। ধম্মোবাপ বলিছি, তোমার কাছে আর কিছু লুকুবো না, বাবা। ছেলের জন্মে রোজ দশ পয়সা ভাড়া দিতে

হয়, কিছু উপায় হোক আর নাই হোক। সে ছেলেটার মায়ের বড্ড অহঙ্কার ; তাকে আর আনি না।

মহিম তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—আচ্ছা, আসলে তুমি সধবা কি বিধবা ? তোমার স্বামী আছে ?

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, স্বামী আছে। তাহার পর কহিল, নেশা-খোর, বাবা, বড্ড নেশা করে ! কোন কিছু কাজ-কর্ম্ম নিজে করতে পারবে না, তাই আমাকে এই সব করতে হয়। না করলে—

—না করলে কি হয় ?

মারে।—বলিয়া স্ত্রীলোকটি মাটীর দিকে মুখ নীচু করিয়া রহিল।

মহিমের হাত ধরিয়া একটা টান দিলাম ; কহিলাম ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। এস, ঐ ট্রাম আসচে। তুমি যে দেখচি এইখান থেকেই বৃন্দাবনের কেচ্ছা সুরু করিয়ে দিলে !

মহিমের বাড়ী ভবানীপুরে। ট্রামে উঠিয়া মহিম বলিল,—একবার আধ ঘণ্টাটাকের জন্যে আমি একটু বাড়ী যাব ; একটা কাজ ভুলে এসেচি।

সুতরাং পূর্ণ থিয়েটারের সামনে উভয়ে নামিয়া পড়িলাম। আমি আর মহিমের বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম না, পাছে ওর বাড়ীর কেহ আমাকে দেখিয়া ফেলে। আমি ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম ; মহিম চলিয়া গেল।

সেই দণ্ডেই, চাদর গায়ে একটি লোক আমার কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল,—একখানা খুব ভাল সিল্ক চাদর আছে, কিনবেন ?

বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবন যাইতেছি, আর সিল্কের চাদর কি হইবে ! তবু জিনিষটা দেখিবার আগ্রহ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। লোকটাকে বলিলাম, দেখি। সে চারিদিকে একবার তাকাইয়া বলিল, বাবু, একটু ঐ আড়ালের দিকে আসুন। লোকটার কথা-বার্ত্তা, হাব ভাবে স্পষ্টই

মনে হইল যে, চোরাই মাল। যাহা হউক, একটু আড়ালে গিয়া তাহার গায়ের চাদরের ভিতর হইতে কাগজে মোড়া সিল্কচাদরখানি বাহির করিল এবং খুব সতর্কতার সহিত আবার চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাম কত?

সে বলিল, দাম বাবু এর আঠার টাকা, আপনি কি দেবেন?

তুমিই বল।

বারোটা টাকা দিয়ে আপনি এখানা নিয়ে নিন, খুব ভাল জিনিষ, বাবু; আঠার টাকার একটি পয়সা কমে আপনি কোথাও পাবেন না।

তুমি কি কোন দোকানে কাজ কর?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোন্ দোকানে?

সেটা আর আপনাকে বলব না, বাবু। নেবেন কি এটা?

চাদরখানা আর একবার ভাল করিয়া দেখিলাম। মন্দ নয়। লইবার জন্ম একটু লোভ হইল। কিন্তু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যে পথে যাত্রা করিয়াছি, এপথে সিল্কের চাদর লইয়া করিবই বা কি? কাটিয়া-কুটিয়া ভিক্ষার ঝুলি করিতে পারা যায়; কিম্বা উত্তরীয়। কহিলাম, ছ'টাকায় হবে?

চোরাই মাল যে, তাহা ভালরূপই বুঝিয়াছিলাম।

লোকটি বলিল, আঠার টাকার জিনিষটা বাবু, ছ'টাকায় কখনো হয়? এক কাজ করুন; দশটাকা হোলে আপনি নিতে পারেন, তার কমে আর পারি না।

আচ্ছা, সাত টাকায় হবে?

শুনুন বাবু, দোকানের দাম এর খাঁটি আঠার টাকা ; এই দেখুন দাম লেখা রয়েচে। আমার হঠাৎ ভয়ানক টাকার দরকার তাই—। আচ্ছা যাক, ন'টাকাই দিন।

না ; আট টাকায় হয় ত দিয়ে যাও, নয় ত—

আচ্ছা আর আট গণ্ডা পয়সা আপনি—

আরে সুরেশ বাবু যে! নিতাই, এতদূর ধাওয়া করেচ ?—বলিয়া যে বন্ধুটি হঠাৎ আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি লোকটাকে কি ইঙ্গিত করাতে সে চাদরখানা আমার হাত হইতে লইয়া বিনা বাক্য-ব্যয়ে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

কালীবাবু কহিলেন, আমি এসে না পড়লেই ঠকেছিলে আর কি !

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি বলুন ত ?

কালীবাবু প্রথমটা খানিক হাসিলেন, তার পর খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর কহিলেন, ব্যাপারটা আর শুনে দরকার নেই।

এমন সময় মহিম আসিয়া পড়িল। সমস্ত শুনিয়া সে-ও কালীবাবুকে ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কি, বলতেই হ'বে।

আমাদের উভয়ের পীড়াপীড়িতে কালীবাবু আর না বলিয়া পারিলেন না। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এই—

শ্যামবাজারে কালীবাবুর একখানা জামা-কাপড়ের দোকান আছে। বাজার মন্দার জন্য, কিছুদিন হইল তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদের কয়েক জনকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে তাহারা অন্য কোথাও কাজ যোগাড় করিতে না পারিয়া, একটা নূতন কাজের পন্থা

আবিষ্কার করিয়া ফেলে। তাহারা প্রত্যহ দোকান হইতে কিছু কিছু মাল নগদ দামে কিনিয়া লইয়া যায় এবং উহা পথের পথিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করে। ইহাদের এই বিক্রয় কার্য্যের প্রধান কৌশল এই যে, কথা-বার্ত্তা এবং হাব-ভাবে ইহারা গ্রাহকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে তাহারা মনে করে যে, জিনিষটা চোরাই মাল এবং প্রকৃত দামের অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে তাহারা উহা পাইতেছে। এই ভাবে খরিদ্দার বুঝিয়া, ইহারা পাঁচ টাকার কাপড়খানাকে সাত টাকা, আট টাকা, কখনো বা দশ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রয় করে এবং এই উপায়ে ইহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

কালীবাবুর মুখে সব শুনিয়া আমি মহিমের মুখের দিকে চাই, আর মহিম আমার মুখের দিকে চায়। মনে মনে ভাবিলাম, এ বিষম স্থান ছেড়ে, বৃন্দাবনে যমুনার পারে গিয়ে বসে থাকাই আমাদের সাজে।

দু'জনে আবার ট্রামে উঠিলাম।

গাড়ী এসপ্লানেডে পৌঁছিলে, মহিম আঙ্গুল দিয়া একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলের দিকে দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, আমাদের বিধু মাষ্টারের এ-পক্ষের সেই বকাটে ছেলেটা! ছেলেটা কতকগুলা বই হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিতেই সে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া আসিল। বলিলাম, গাড়ী যে ছেড়ে দেবে, কেমন আছ হে?

সে বলিল, ভাল আছি। বলিয়া, বেঞ্চের একধারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ডাল্‌হাউসী স্কোয়ারে নেবে যাব'খন।

আমি তাহার মুখের দিকে একটু চাহিয়া বলিলাম, তোমার নামটি কি, ভুলে গেছি হে।

মাণিকলাল।

তাহার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া কহিলাম, মাণিক, তোমার বাবা মারা যা'বার পর, আর ত তোমাদের কোন খবর জানি না। বিধুবাবু কিছু দেনা-পত্তর রেখে গেছলেন না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। জানেন ত, স্কুলমাষ্টারদের যা' হয়! মরে গেলে, তাদের শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে যমের কাছে পর্য্যন্ত কিছু চাঁদার জন্যে হাত পাত্‌তে হয়।

তোমার হাতে ও সব কি বই, মাণিক ?

বাবার সেই 'স্বাস্থ্যবিধি' বইখানা। সম্পত্তির ভেতর হাজার-পাঁচেক কাপি ঐ 'স্বাস্থ্যবিধি' তাঁর পেয়েছিলুম। জঞ্জাল হোয়ে পড়েছিল এতদিন; হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দী এলো। বইগুলোর কভার আর টাইটেল্ পেজ ফেলে দিয়ে, এবং তা' নতুন করে একটু অদল-বদল করে—ছাপিয়ে ফেললুম; দাম চার আনার জায়গায় দশ আনা করলুম; তার ওপর একটু কায়দা-কারণ করে বিক্রী করতে সুরু করে দিলুম। আমাদের এই জাতটা মনে করে, নিজেদের খুব চতুর; কিন্তু এমন বোকা জাত ত দুনিয়ায় আর নেই! বইএর নাম দেখে, আর এই নতুন 'ষ্টাইল্' দেখে ঝড়া-ঝড়্ সব কিনচে। ছ'মাসের মধ্যেই হাজার তিনেক বিক্রী হোয়ে গেছে।

সবিস্ময়ে তাহার হাত হইতে একখানা বই লইয়া দেখিলাম। বই খানার পাতাগুলি সরু একটা কাগজের শ্লিপ দিয়া আঁটা। শ্লিপ না ছিঁড়িয়া বই খুলিবার উপায় নাই। কভারের উপর সুন্দর ও বড় বড় অক্ষরে বইয়ের নাম লেখা রহিয়াছে—'যৌবন-শ্রী ও তাহা অটুট রাখিবার উপায়।'

ভাবিলাম, উঃ, সেই ছেলেটা! বকাটের একশেষ! চিরকাল বিধু বাবুকে জ্বালিয়ে এসেচে! কি দুষ্টু মৎলব করেচে, দেখ একবার! কেমন নামটা দিয়েছে বইখানার। আবার কেনবার আগে একটু পড়ে দেখবারও

উপায় নেই। বিধুর ছেলে না হোলে, আর ব্যাপারটা এরকম জানতে না পারলে, আমিই ত একখানা নিশ্চয় কিনে ফেলতুম।

ট্রাম ডালহাউসী স্কোয়ারে আসিয়া পড়িলে মাণিক নামিয়া পড়িল। যত-ক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, আমি তাহার দিকে দেখিতে লাগিলাম ও তাহার কথাগুলি ভাবিতে লাগিলাম।

হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিয়া মহিম জানিয়া আসিল, গাড়ীর তথনো ঘণ্টা দেড়েক দেরী। খানিক পরে আমার ট্রেণভাড়ার টাকাটা মহিমের হাতে দিয়া দিলাম। মহিম বৃন্দাবনের দুইখানা টিকেট কিনিয়া আনিল। তখন 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া আমি গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। মহিম একটু হাসিয়া বলিল, বৃন্দাবনের যাত্রী—'দুর্গা-দুর্গা' কেন আর, 'হরি হরি' বল। মনে মনে 'হরি হরি' বলিতে বলিতে কাপড়-গামচার পোঁটলাটা সুবিধামত জায়গায় রাখিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যাট্‌ফরমের লোক-চলাচল দেখিতে লাগিলাম।

মহিমের মনের মধ্যে যে খুবই স্ফূর্ত্তি এবং উৎসাহ, তাহা তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু আমার মনটা এতক্ষণ পরে যেন একটু খারাপ হইয়া উঠিল। কোথায় যেন মনের আকাশে ছায়া পড়িয়া আসিল। মনে পড়িল, পথের মাঝে আজিকার তিন মূর্ত্তির কথা। সেই সধবা-বিধবা স্ত্রীলোকটি, সিল্কের চাদরওলা, আর বিধুর ছেলে ঐ সাতরাজার ধন অমূল্য মাণিকটি! বৈরাগ্য-পথের যাত্রা-সুরুতেই এই তিন সাধু দর্শন! শুভ লক্ষণ যে, তার আর সন্দেহই নেই।

কিন্তু মনের অন্ধকার সেজন্যও নয়।

এই সময় অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া এক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীটাতে আসিয়া ঢুকিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সারা গাড়ীখানার মধ্যে যেন যাত্রার আসর জমিয়া উঠিল,—কেহ বাঁশী বাজাইতে লাগিল,

কেহ ঝুন্-ঝুনি ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল, কাহারো হাতে রবারের ফানুস, কাহারো হাতে সেলুলয়েডের পুতুল। কেহ লাফাইতে লাফাইতে ছড়া বলিতে লাগিল, কেহ গান গাহিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনটা তখনই আমার গৃহে গিয়া পৌঁছাইল। আমি যেন দেখিতে লাগিলাম, আমার বাড়ীর ভূত-প্রেতের দলও যেন সব তাণ্ডব-নৃত্যে মাতিয়াছে! তাদের যত উৎপাত আমারই ঘরে। বলিলে শোনে না, আরও বেশী করিয়া করে। আমার ছোট মেয়ের বড় খোকা নাহুটাই সব চেয়ে দুষ্টু! তাকে ঠেলে দিলে, সে গলা ধরে ঝুলে পড়ে। দুষ্টুটার সকালে একটু গা গরম হোয়েছিল, এ বেলা বোধ হয় জ্বরটা বেশী করেই হোয়ে থাকবে। আমার মেজ ছেলের বড় মেয়ে শৈলর জন্যে আমার কৌটার এলাচ-লবঙ্গ আর থাকবার জো নেই, কোন্ ফাঁকে যে এসে সব নিয়ে যায়, কিছুতেই ধরতে পারি না।

চা খাবার সময় হোয়েচে। আমাকে দেখতে না পেয়ে, সকলে খুঁজে খুঁজে নাকাল হচ্চে আর কি! আজ আর আমি বাড়ী নেই, বিশুটা আজ খালিখালি সদর পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়বে আর কি?

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

গাড়ী ছাড়িবার—প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গেল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মহিম আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চা খেতে হবে বুঝি, না?

আমি দরজা খুলিয়া প্ল্যাট্ফরমে নামিয়া পড়িলাম।

মহিম কহিল, ঐ যে চা! এই, ইধার আও—ইধার!

আমি বারণ করিলাম; বলিলাম, থাক্—খাব না।

খাবে না?

বাড়ী গিয়ে খাব।

বাড়ী গিয়ে? বৃন্দাবন যাবে না?

না।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত মহিম জিজ্ঞাসা করিল, যাবে না? কারণ?

আসল কারণটা বলিতে বাধিল। বলিলাম, পথে আসতে তিন মূর্ত্তির ত্র্যহস্পর্শ যোগ। এ ক্ষেপে আর যাব না। তুমি ঠিকানাটা জানিও, পরে দেখা যাবে।

মহিম আর কোন কথা না বলিয়া শুধু মহা বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

২২শে বৈশাখ

সে দিন ২২শে বৈশাখ।

তখন সূর্য্য উঠেছে, কিন্তু তত রোদ ওঠে নি। বেলা বোধ হয় ছ'টা বেজে গিয়েছিলো। সকালে বেড়ানোর পক্ষে সেদিন একটু বেলা হোয়েই পড়েছিল। তা হোলেও বেরিয়ে পড়লুম।

বাসা থেকে গলির পথে খানিকটা এসেই পথের ধারে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লুম। পাশেই একটা এঁদো পুকুর। তার পাড়ের ওপরকার বুনো ঝোপটার পাশে কতকগুলো হাড়-গোড়, আর একটা বাচ্ছা ছাগলের ছোট্ট মাথা পড়েছিল। মাথাটায় মাংস আর কিছু ছিল না—কুরে কুরে খেয়ে কিছুই আর তাতে নেই। মনটা ছাঁৎ করে উঠলো। আহা, কালকের রাত্রের সেই বাচ্ছাটা ত! কাল তখনই আমি ভেবেছিলুম যে, হয়ত বাচ্ছাটা শিয়ালের পেটেই যাবে! তাই গিয়েচে।

রাত তখন দু'টো। গরমের জন্যে ঘুমোতে পারি নি; এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে সেইমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছিল, একটা বাচ্ছা ছাগলের অনবরত ডাকে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল। পথের ধারের ঘরখানাতেই শুয়েছিলুম। বাচ্ছাটা ক্রমাগত ডাকতে ডাকতে পথ দিয়ে এই দিকেই আসছিলো। যাদের ছাগল, কি ক'রে তাদের আশ্রয় থেকে এত রাত্রে ও ছিট্‌কে বাইরে এসে পড়ল, কেনই বা পড়ল, ওর মা-ই বা কোথায়,—শুয়ে শুয়ে সেই সবই খালি ভাবতে লাগলুম। আহা! মা-হারা শিশু! হয় ত ওর মাকে ও দেখতে পাচ্চে না, তাই মা মা করে মায়ের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে।

কিন্তু এখনি ত ও শিয়ালের পেটে যাবে! মায়ের জন্যে ডেকে ডেকে ও যে ওর শত্রুকেই সংবাদ দিয়ে ডাকচে! টপ্ করে উঠে পড়লুম। দরজার খিল খোলার শব্দে আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললুম, এখনি বাচ্ছাটাকে শিয়ালে ধরবে, ওকে কোলে করে এনে সিঁড়ির ঘরটার মধ্যে রেখে দি। স্ত্রী বললেন, ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছ? আমি বল্লুম, ভবিষ্যৎ মানে?

—ভবিষ্যৎ মানে এই, যে, যাদের ছাগল, তারা কাল বলবেন, যে ছাগলটাকে মেরে খাবার জন্যেই ধরে রাখা হোয়েছিল।

—আরে পাগল, কাল সকালেই ত যাদের ছাগল, খুঁজে তাদের দিয়ে আসব।

—তাতে রেহাই পাবে না। তারা বলবে যে, খাবার জন্যেই ধরেছিল; তারপর বাচ্ছাটা সারা রাত ভ্যা ভ্যা করে ডেকেচে, আশ-পাশের বাড়ীর লোকেরা সব জানতে পেরে গেছে, সুতরাং সুবিধে করতে না পেরে, তাই......; বুঝতে পাচ্চ না? আজকালকার দিনে উপকার করতে যাওয়ার ভেতরও যে কি বিপদ, এটা তুমি জেনেও ভুলে যাচ্চ?

ক্রমেই তখন বাচ্ছাটার ডাক মিলিয়ে আসছিল। সে তখন অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েচে। ভাবলুম—তবে থাক্। দরজায় খিল বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লুম। ছাগল-বাচ্ছাটার ডাক আর যেন শোনা যাচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে ভাবলুম, নিয়ে এলেই হোত। না-হয় বদনামের ভাগীই হতুম, বাচ্ছাটা ত বাঁচতো। ভাল কাজ করলুম না। মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে আমার পক্ষে এটা দুর্ব্বলতার কাজই হোল। আহা! ছোট্ট বাচ্ছা! ডাকটার ভেতরও যেন দুধ-দুধ ভাব, যেন তা নরম

তুল-তুলে। মনে হয় ওর ঠোঁটের দু'পাশে ওর মা'র দুধ এখনো লেগে শুকিয়ে রয়েচে।

খানিক পরেই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তার পর সকালে উঠে, বেড়াতে বেরিয়ে, পথে এই ব্যাপার। মনটা খুবই খারাপ হোয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার বেড়াবার পথে অগ্রসর হ'লুম।

মোড়ের কাছে টিনের বাড়ীটার সামনে, দু'চার জন লোক ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, আর সেখান থেকে বালক কণ্ঠের একটা আর্ত্তনাদ আসছিল। কাছে গিয়ে দেখি, নোন্কু বলে যে ছেলেটী একগাছা কঞ্চি নিয়ে চাকা ঘু'রোতে ঘু'রোতে প্রায়ই সকাল-বিকালে আমার বাসার সামনেকার পথ দিয়ে যায়,—এ সেই ছেলেটী। এই কালও বিকালে সে এক হাতে একটা কাগজের নৌকো আর এক হাতে একটা টিনের বাঁশী নিয়ে বাজাতে বাজাতে আমার বাসার সামনে বেনেদের পোড়ো মাঠটায় ছুটে ছুটে খেলা করছিলো। সেদিন যখন মল্লিকদের বাগান থেকে চাঁপা ফুল গুলো হাতে করে আনছিলুম—আমার ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখব বলে, নোন্কু তা দেখতে পেয়ে, ছুটে এসে আমার পেছু নিয়েছিলো। তার মুখ দেখে মনে হোল, যেন সে কিছু বলবে বলবে, অথচ বলতে পারচে না। আমি বললুম, কিরে, কি চাস্? সে ইসারায় ফুলগুলো দেখিয়ে বললে, দেবে আমায়? ভাবলুম, আমার কাচের ফুলদানীর চেয়ে এই কচি-হাতের ফুলদানীতেই ফুলগুলোর শোভা শতগুণে বাড়বে। এ জিনিসটায় যে ওদেরই অধিকার। আমি সমস্ত ফুল গুলোই তাকে দিয়ে দিলুম। এ সেই নন্কু। বয়স হবে তার বছর পাঁচ-ছয়। শুনলুম——মর্ণিং স্কুল, ৬টা বেজে গেছে, তবু সে

তার মায়ের পাশে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছিলো; স্কুলে যাবার চাড় নেই। তাই তার বাবা তাকে টেনে, হিঁচড়ে, মারতে মারতে———। হায় রে! পাঁচ বছরের ধেড়ে খোকা, তার কি বেলা ৬টা পর্য্যন্ত বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে ঘুমানো সাজে! তার বাবাকে বললুম, ছেলেটী কেঁদে যে সারা হোয়ে গেল। তিনি বল্লেন, পাজীর একশেষ মশাই! লেখা নেই, পড়া নেই, খালি সারাদিন খেলা করে বেড়াবে। কোথায় বাঁশী, কোথায় চাকা, কোথায় বল্, কোথায় লুকোচুরী, কোথায় ছুটো-ছুটি— সমস্ত দিন ধরে খালি এই সব। আমি বল্লুম, ভারি অন্যায় ত; এত বড় ছেলে—একটু বোঝা উচিত! তার বাবা বল্লেন, বলুন ত মশাই, কোন্ বাড়ীর ছেলে এমনি করে খেলিয়ে বেড়ায়? দেখুন গিয়ে স্কুলে, ওর মত কত ছেলে, বই সেলেট নিয়ে সব স্কুলে গেছে, আর এ বেটার·········।—বলেই ঠাস্ ঠাস্ করে আরও দুই চারিটা চাপড় শিশুটীর পিঠে বসিয়ে দিলেন। তাড়া-তাড়ি কি একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলো, আটকে ফেললুম। ভাবলুম, চলবে না। কোন যুক্তি, কোন উপদেশ, কোন মন্তব্য—চলবে না। কারণ, বাপটি শুনেছি শিক্ষিত, অর্থাৎ দু'একটা পাস-টাস করা। চাণক্যের নজীর হাজীর করে ফেলবেন—লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ বর্ষানি———।

যেতে যেতে ভাবলুম, এই আমাদের ঘরের শিশুরা, এই আমাদের ঘরের বাপ, এই আমাদের শিক্ষা। পাঁচবছরের শিশু, সে একটু খেলতে পাবে না, একটু ছুটোছুটি করতে পাবে না, তার মায়ের কাছে শুয়ে বেলা ৬টা পর্য্যন্ত তার ঘুমোবার অধিকার নেই। তার আগে তাকে উঠে, বই-সেলেট হাতে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে! আকাশই ভেঙ্গে পড়ুক আর পৃথিবীই রসাতলে যাক, তবু তাকে যেতেই হবে। তা না হোলে

যে তার বিদ্যা হবে না। পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিশুর বিদ্যালাভের জন্যে, শিশুর পিতার কী আকুল আগ্রহ!

গঙ্গার ধারের দিকে বেড়াতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। পিছন থেকে কেবলি কাণে আসতে লাগলো——একবার সেই ছাগ-শিশুর কাতর ডাক আর একবার এই মানব-শিশুর আকুল কান্নার চীৎকার। কী মন নিয়েই যে পৃথিবীতে এসেছিলুম! মনটা একেবারেই খিচড়ে গেল। কিছুই ভাল লাগলো না। দুই কাণে দুই অসহায় শিশুর ক্রন্দন ক্রমাগতই ভেসে আসতে লাগলো। বেড়াতে যাওয়া আর হোয়ে উঠল না; বাসার পথেই আবার ফিরলুম।

বাসায় এসে ঘরে ঢুকতেই আমার পুঁচকে ছেলেটা কোথা থেকে ছুটে এসে আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরলে। তার এক হাতে ঠ্যাং-ভাঙ্গা কাঠের ঘোড়া, আর এক হাতে খান-কতক ছেঁড়া তাস।

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলুম। কিন্তু ঐ ২২শে বোশেখ সারাদিন ধরেই আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ব্যথার ঢেউ এসে আমায় কাতর করে ফেলেছিলো।

সেকালের পাঠশালা

১২৯৬ সালের গ্রীষ্মকাল। বয়স আমার তখন ৯ কি ১০ বৎসর। সকাল বেলা। সূর্য্যদেব উঠি-উঠি করিতেছেন। কানাই, কোঁচড়ের মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে আমাদের উঠানের মাঝখানে আসিয়া হাঁকিল—পাঠশালে যাবি না? ঠাকুমা আমার হইয়া জবাব দিলেন—যাবে না ত কি? কিন্তু যে যাইবে, তাহার সেদিন যাইবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। ঠাকুমার ভয়ে স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার সাহসও হইল না। ওদিকে গুরু-মশাইয়ের তাড়নার ভয়, এ-দিকে ঠাকুমার ভয়। সুতরাং স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, পাঠশালায়ও যাইব না অথচ পুঁথি-পত্তর লইয়া কানাইয়ের সহিত যাত্রাও করিব।

ঠাকুমা কোঁচড়ে কিছু মুড়ি ও গোটা দুই নারিকেল নাড়ু ঢালিয়া দিলেন। তালপাতার পাত্‌তাড়ি, কুমোর বাড়ীর দোয়াত, কঞ্চির কলম ইত্যাদি লইয়া, মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে কানাইয়ের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

জোল পার হইয়া, জোলাপাড়ার পথ দিয়া আসিতে আসিতে কানু মোড়লের তাঁতের ঠকাঠক্ শব্দ কাণে আসিল। কানাইকে বলিলাম—চ, গামছা বোনা দেখি গে। কানাই রাজী হইল। দু'জনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গামছা বোনা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁতের একঘেয়ে ঠকাঠক্ ভাল লাগিল না। কানু মোড়লের বাহাদুরীটা প্রথমে মনের মধ্যে যতটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত ততটা আর রহিল না। মনে মনে

ভাবিলাম—ভারি ত গামছা বোনা। বড় হোলে, বাড়ীতে তাঁত বসিয়ে আমি ঘর-জোড়া গামছা বুনবো।

অতঃপর ওখান হইতে একেবারে শশী ময়রার দোকান। শশী তখন তাহার টিয়াপাখীটার দাঁড়ে ভিজা ছোলা দিতেছিল আর টিয়াটা অধৈর্য্য হইয়া প্রচণ্ড কলরব জুড়িয়া দিয়াছিল। শশীকে কহিলাম—শশী, 'গুড়-ছোলা' আছে? শশী কহিল—আছে।

ঠাকুমা বলে দিয়েছে, আধ পয়সার দিতে; আধলা বাকী থাকবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে শশী আধ পয়সার 'গুড় ছোলা' দিল এবং বিনাবাক্যব্যয়ে আমিও তাহাতে কামড় লাগাইলাম। খানিকটা অবশ্য কানাইকেও দিলাম। এ-কালের ছেলারা হয় ত 'গুড়-ছোলা' দ্রব্যটি ঠিক না-বুঝিতেও পারে। ইহা ভিজা-ছোলা এবং তৎসহ গুড় নয়। ভাজা-ছোলা গুড়ের সহিত পাক করিয়া পাটালীর আকারে ইহা প্রস্তুত।

যাহা হউক, 'গুড়-ছোলার' স্বাদমাধুর্য্য ভোগ করিতে করিতে উভয়ে ত অগ্রসর হইলাম, কিন্তু চুরী যখন ধরা পড়িবে তখন ঠাকুমার মাধুর্য্যহীন চপেটাঘাত উপভোগের ভয়টাও অন্তর ভরিয়া উঠিল। তবে ভবিষ্যৎটা বর্ত্তমানের স্রোত ঠেলিয়া তেমন আসিতে পারিল না।

কানাই বলিল—টোল্-পুকুরের পাড়ের জাম তলাতে যাবি? অনেক জাম পড়ে।

সুতরাং টোল্-পুকুরের পাড়ে আসা হইল এবং দেখা গেল—কানাইয়ের কথা, ষোল আনার উপর আঠার আনা সত্য। তখন জামতলাতে পাত্তাড়ি প্রভৃতি রাখিয়া, দুইজনে মহানন্দে·········

মহানন্দে জাম খাওয়া হইল, কিন্তু তাঁতিদের বিভূতি দূর হইতে ঝোপের পাশ থেকে উঁকি দিয়া আমাদের দিকে একবার দেখিয়া,

পাঠশালার পথে ছুটিয়া গেল। কানাইকে বলিলাম, ওরে, বিভুটা গিয়ে হয়ত পোন্সাইকে বলে দেবে। পোন্সাই মানে পণ্ডিত মশাই। কানাই বলিল, দিক্ গে। আমি বলিলাম, তা হোলে হয় ত এক্ষুনি সব আমাদের ধরবার জন্তে আসবে। চ' এখান থেকে পালাই। ছুট! ছুট!—উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে মাঠের ধারে কুমোরদের শালে গিয়া হাজির হইলাম। ভুবন কুমোর তখন চাক ঘুরাইয়া হাঁড়ি প্রস্তুত করিতেছিল। চাকের পাশে বসিয়া বসিয়া একান্ত মনে দু'জনে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, কি গো—আজ বুঝি তোমরা পাঠশালা পালিয়েছ? কানাই বলিল, গিয়েছিলুম—চলে এলুম। আমি বলিলাম, পোন্সাই সকলকে আজ ছুটী দিয়ে দিলে। ভুবন কহিল, কেন?—আমি কহিলাম, পোন্সাইয়ের যে খুব পেটের অসুখ করেচে, তাই। দেখিলাম, বেশীক্ষণ এখানে থাকা সুবিধা হইবে না। কানাইকে কাণে কাণে কহিলাম, চ বিশালাক্ষি-তলায় ঠাকুরের পূজো দেখি গে।

শাল হইতে বাহির হইয়া দু'জনে বিশালাক্ষিতলায় গিয়ে হাজির হইলাম। হরিপদ ঠাকুর বোধ হয় তখন পূজা শেষ করিয়াছিল। আমাদের দেখিয়া কহিল, পেসাদ খাবি ত এখানে আয়। আমরা মন্দিরের দরজার সামনে গিয়া বসিলাম। কিন্তু, ভাগ্য যদি অপ্রসন্ন হয়, তা' হোলে ভাজা মাছ যেমন কড়া থেকে জলে লাফাইয়া পালায়, আমাদেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। হরিপদ ঠাকুরের হাত হইতে প্রসাদের ফল-মূল, বাতাসা লইতে যাইব, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পিছন হইতে যমদূতের মত পাঁচ ছয় জন আসিয়া আমাদের উভয়কে জাপ্টাইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখি—পাঠশালারই সব ছেলেরা। সঙ্গে সর্দ্দার পোড়ো—ক্যাব্লা। ক্যাব্লা হুঙ্কার দিয়া কহিল, পাঠশাল পালানো হোয়েচে! চ্যাং-দোলা করে ধরে নিয়ে চল্ দু'জনকে।

তাহাই হইল। আমরাও যাইব না, তাহারাও ছাড়িবে না। যথাসাধ্য দু'জনে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে লাগিলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আধ ডজন গয়-গবাক্ষ-নীল প্রভৃতির সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিব কেন? যাইতেই হইল। পোন্‌সাই জলদ-গম্ভীরস্বরে বাড়ি আস্ফালন করিয়া কহিলেন, হ্যাঁরে কেনো, হ্যাঁরে পেঁচো, পালানো বিদ্যে কবে থেকে শিখলি রে? এদিকে আয়! আয় বল্‌চি—শীগ্‌গীর! ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলাম, পালাইনি পোন্‌সাই। ঠাকুমা বোলেছিল যে, যাবার সময় পণ্ডিত মশায়ের জন্যে নতুন গোরুর দুধ খানিকটা দোবো, নিয়ে যাস্! আদ্ধেক পথে এসে মনে পড়ে গেল, তাই ফিরে আন্‌তে যাচ্ছিলুম। আমরা দু'জনে ছুটে গিয়ে আনব পোন্‌সাই? পণ্ডিত কহিলেন, নতুন গরুর দুধ? যা যা নিয়ে আয়, বেশী করে নিয়ে আসবি। বুঝলি? তা না আনলে দেখবি মজাটা। কানাইকে লইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পোন্‌সাই কহিলেন, তা ও-কথাটা ক্যাব্‌লাকে ত বল্লেই পারতিস্? সটান্ মিথ্যা বলিয়া বলিলাম, বোলেছিলুম পোন্‌সাই; তবুত ও আমাদের চ্যাং-দোলা করে আর মারতে মারতে নিয়ে এল। পোন্‌সাই তখন রক্ত-চক্ষুর দৃষ্টিতে ক্যাবলার পানে চাহিয়া হাঁকিলেন—ক্যাবলা!

বিপদ মুক্তির পর প্রফুল্ল অন্তরে আমরা দু'জন তখন ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।
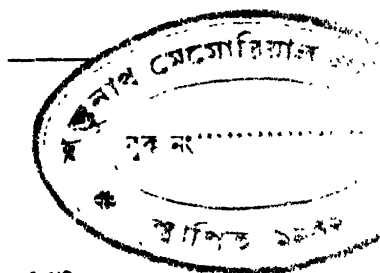
মুলতুবী দুর্গোৎসব

সে বৎসর পূজার পূর্ব্বে হঠাৎ দেশ থেকে শরৎ ঘোষের একখানা পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে যে, গ্রামে খুব সমারোহ করিয়া বারোয়ারী দুর্গাপূজা হইবে, আমার যাওয়া চাই-ই। ভাবিলাম—নারাণপুরে বহু বৎসর যাই নাই, এই উপলক্ষ্যে একবার ঘুরিয়া আসা যাউক।

নারাণপুর—২৪ পরগণারই অন্তর্গত; বারাসতের ওই দিকে। এক সময়ে বেশ বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ায় একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। একটু অবস্থাপন্ন যাহারা, তাহারা সাতপুরুষের ভিটা-মাটির মায়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গিয়া বাস করিতেছে। যাহাদের কোন উপায় নাই, তাহারাই দেশে থাকিয়া কতক মরিয়াছে, কতক মরণাপন্ন হইয়া কোনরকমে দিন কাটাইতেছে।

পূজার দিনকতক বাকী থাকিতেই পোঁটলা-পুঁটলি, বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া একদিন মধ্যাহ্নে নারাণপুর যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেণে গিয়া চাপিলাম। নারাণপুরেই ষ্টেসন। তাহা হইলেও ষ্টেসন হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত পথ—প্রায় একটী ক্রোশ হইবে। বেলা অনুমান চারিটার সময় আমরা ট্রেণ হইতে নামিলাম। বোধ হয় পনর বৎসর পরে ষ্টেসনের মাটিতে পা দিলাম। দেখিলাম—মোটামুটি সবই ঠিক তেমনি আছে বটে, অথচ খুব বড় রকম কিছু একটা যেন নাই। ষ্টেসনের সেই ঘর, সেই 'সেড্', সেই প্রকাণ্ড বকুল আর আঁশফল গাছের তলা, টিকিটের ঘণ্টা দিবার সেই ঘণ্টা—সবই ঠিক তেমনি আছে। পূবদিকের দিগন্তব্যাপী সেই ধূ-ধূ প্রান্তর, পশ্চিমদিকের সুবিস্তীর্ণ

ধানের মাঠ, উত্তরে হাঠতলার চালা কয়খানা, দক্ষিণে দাশু ময়রার দোকান, বোষ্টমদের সেই ছোট্ট মুদীখানাটা—সব ঠিকই আছে; নূতনের মধ্যে দেখিলাম, কাহাদের একখানি চা-য়ের দোকান এবং ছোট্ট একটী মণিহারী দোকান। মণিহারী দোকানটাতে এক পয়সার তাস, ছোট ছোট স্যালু-লয়েডের পুতুল, মাথার ক্লিপ, জাপানী লেড পেনসিল, হারিকেনের চিমনি, কাগজের ঘুড়ি, গুলি সুতা, অল্প দামের সাবান, ক্রীমের শিশি, প্রভৃতি সস্তার মালে ভরা। অবিক্রীত হইয়া বহুদিন দোকানে খোলা পড়িয়া থাকিয়া সেগুলির রং ও অবস্থা ধুলায় বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আগে যে ষ্টেসন মাষ্টার ছিলেন, দেখিলাম তিনি নাই। অন্য একটী নূতন লোক। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কতদিন এসেচেন? তিনি প্রথমটা আমার প্রশ্নে ততটা মনোযোগ দিলেন না। পুনরায় প্রশ্নটী করায় কহিলেন, বছর ৫।৬ হবে। এই ৫।৬ বছরের ম্যালেরিয়ার ধাক্কায় তাঁহার চেহারাটী সেঁকা বেগুনের মত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু সেই চেহারার প্রতি যত্নের তাঁহার কোন ক্রটী দেখিলাম না। চেহারার প্রতি বলিলে কথাটা ঠিক হয় না, চুলের প্রতি হইবে। তাঁহার চুলের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়, জগতের মধ্যে এই জিনিসটাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। স্বাস্থ্য নাই, সম্পদ নাই—আছে তাঁহার চুলের কায়দা। সুখ নাই, শান্তি নাই, আছে তাঁহার তেড়ির বাহার। পিছনের চুলগুলি খুব ছোট করিয়া ছাঁটা; সম্মুখে তাহার বহর—হাতখানেকের কম নহে। জুলপী তুইটাই লক্ষ্য করিবার বস্তু। ইহা উপরের দিকে ওঠান কিম্বা নীচের দিকে নামান নহে। সে সব প্যাটার্ণ পুরাতন হইয়া যাওয়ায়, এ প্যাটার্ণে অদ্ভুত অভিনবত্ব টানিয়া আনা হইয়াছে। ইহা অনেকটা বিদ্যাসুন্দরী প্যাটার্ণ। বিদ্যাসুন্দরে, সুন্দরের যেমন গালপাট্টা ছিল,

এ গালপাট্টা জুল্পীও সেই রকমের। হায় বাঙালী নব্য বাবু! দেহে তোমার স্বাস্থ্য নাই, পেটে অন্ন নাই, মস্তিষ্কে জ্ঞানবুদ্ধির লেশ মাত্র নাই, দিনান্তে একবেলা তোমার উনানে হাঁড়ি চড়ে না, ছেলে মেয়ে একটু দুধের মুখ দেখতে পায় না, তোমার অক্ষমতার জন্য তোমার বাড়ীর ঝি-বউকে দুষ্টেরা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া ধর্ষণ করিতেছে, আর তুমি নাপিতের কাঁচির তলায় মাথা পাতিয়া, আয়নার সম্মুখে চিরুণী লইয়া বসিয়া, তোমার চুলের বাহারের জন্য মশগুল্ হইয়া আছ! হায় ধ্বংসোন্মুখ জাতির যুবক! তোমার বাঁচিবার আর কোন উপায়ই তুমি রাখিলে না। বায়োস্কোপ, চুল আর চা—এই তিনটা দ্রব্য উপলক্ষ্য করিয়া তুমি নিজেও মজিলে, এত-বড় জাতিটাকেও চিরতরে রসাতলে পাঠালে।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া একখানা গরুর গাড়ীর উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া আমি সেই মেঠো পথে হাঁটিয়া চলিলাম। পথের দুই পার্শ্বেই ধান্য ক্ষেত্র—কিম্বা ধান্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়াই পথ। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, আশ্বিনের এমন দিনে এই সব ক্ষেতে গোছা গোছা ঝাড়-বাঁধা ধানের চারাগুলি তিন চার হাত দীর্ঘ হইয়া অপূর্ব্ব সবুজ শোভায় সারা মাঠ ঝল্মল্ করিত। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! দেখিলাম, প্রায় ৭০০ বিঘার মাঠখানিতে কোন প্রকারে আবাদের কাজ শেষ হইয়াছে। সরু সরু কাটির মত ধানের চারাগুলি তাহাদের ক্ষীণ ও অপুষ্ট দেহ লইয়া জলাভাবে আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেক ক্ষেতে চাষই হয় নাই। পাকা চুলের মাথা মধ্যস্থ টাকের মত শরতের পড়ন্ত রৌদ্রে তথাকার শুক্‌না মাটি চক্‌চক্ করিতেছে। অনেক দূরে ধানের মাঠ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে নন্দীপুরের প্রান্তস্থিত ঝাউ গাছগুলি আগের দিনের মতই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাই ত

বলিতেছিলাম যে, ছেলেবেলায় যেখানে যাহা ছিল দেখিয়াছি, এখনো সব ঠিক তেমনই আছে; অথচ মনে হয়—কিছুই নাই। আসল কথা, কাঠামো আছে—প্রাণ নাই; বাহিরের গড়ন আছে, ভিতরের সারবস্তু নাই।

দুই পার্শ্বে দেখিতে দেখিতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আশ্বিনের পড়ন্ত সূর্য্যে ভাদ্রের মত তীক্ষ্ণতা ছিল না। সুতরাং বেশ আরামে ও আনন্দে চলিতে লাগিলাম। মুক্ত প্রান্তরের স্নিগ্ধ ঝির-ঝিরে বাতাস লাগিয়া মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। হতভাগ্য দেশের সব গিয়াছে। তাহার সাবেক রূপ-রস-গন্ধের আর কিছুই নাই। শুধু আশ্বিনে অম্বিকার আগমনে, এই সময়টা বাঙ্গলার আকাশে যে কী রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহার বাতাসে যে কী মধু বহিয়া যায়, তাহা আর বলিবার নয়। সব গিয়াছে তবু এই জিনিষটী এখনো যায় নাই। ভগবান কি মনে করিয়া এই শারদীয়া শ্রীটি এখনো বজায় রাখিয়াছেন জানি না।

চলিতে লাগিলাম। গ্রামে ঢুকিবার পথেই, পথের বাঁ ধারে মোড়লদের ডোবাটা থেকে পাট-পচা গন্ধে সহসা যেন মাথাটা ধরিয়া উঠিল। মনে হোল, সমস্ত পল্লীটা যেন পাটপচানীর দুর্গন্ধে ভরিয়া আছে। খালি মশার উপর রাগ করিলে চলিবে কেন? মশার 'কাজিন ব্রাদার'দেরও ত অভাব নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিকাশের এই সময়টা পল্লীতে পল্লীতে পচা পাট তাহার দুর্গন্ধ শ্বাস ছাড়িয়া যে কী মহা অনিষ্ট সাধন করে তাহা আর বলিবার নয়। দেশে যখন পাট ছিল না, তখন ম্যালেরিয়াও ছিল না। বহুমূল্য পাট বিক্রয় করিয়াও চাষীর পেটে এখন অন্ন জোটে না।

'উই আর সেভেন্'

বারোয়ারি তলাতে দেখিলাম, অশথ গাছের সঙ্গে মস্ত এক বাঁশ বাধিয়া তাহাতে নিশান টাঙ্গানো হইয়াছে। অর্থাৎ দুর্গোৎসব হইবে—তাহারই নিশানা। শরৎ ঘোষ দুই হাঁটু আর মাথা এক করিয়া, একটা ডাবা হুকায় তামাক খাইতেছিল। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, Hallow! mintani cruden vixit! (হ্যালো! মিন্টানি ক্রুডেন্ ভিকসিট্!) এই কথাটার কোন মানে নাই। ইহা না ইংরাজী, না বাংলা, না ফারসী, না আর-কিছু। শরতের কোন বিষয়ে আনন্দ হইলেই সে ঐ বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিত। হায় 'ক্রুডেন ভিক্সিট'! শ্মশান গ্রামের ছাই গাদার উপর শরৎ ও তুমি এখনো আছ।

শরৎ আর আমি বাল্যে কালী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়িতাম। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের লেখা পড়ার পাঠ সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। বাপের পয়সা ছিল। তাহারই জোরে সে নিষ্কর্ম্মার মত বাটীতে বসিয়া থাকিয়া পল্লীর সুখ এবং ম্যালেরিয়ার মাধুর্য্য ভোগ করিয়া আসিতেছে। সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা বছর দুই তিনের বড় ছিল অর্থাৎ ষাইটের শুভ্র অঞ্চলের সবটাই বোধ হয় তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

শরতের মুখে শুনিলাম, পূজার কোন আশাই ছিল না। হঠাৎ বহু বৎসর পরে কি মনে করিয়া সুরেন গাঙ্গুলী সস্ত্রীক দেশের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে সুরু করিয়াছে। সে আসিয়াই এই দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছে। ব্যবস্থা অবশ্য পল্লীর সকলে সমবেতভাবে করিবে, তবে ব্যয়াদি নির্ব্বাহের ভার সুরেন গাঙ্গুলীর।

সুরেন গাঙ্গুলী বহুদিন দেশ ত্যাগ করিয়াছিল। কলিকাতায় কন্ট্রাকটারী কাজ করিয়া সে অনেক পয়সার মালীক। তাহার চাল-চলন সবই

সাহেবী কায়দায়। সে যে কেন হঠাৎ এই বন-জঙ্গল-ম্যালেরিয়ায় ভরা গ্রামের উপর ঝুঁকিল বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাহার এই সুমতির জন্য মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

তাহার পর কয়দিন বেশ আনন্দেই কাটিল। পূজার আয়োজন খুব দ্রুতভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল। সবচেয়ে উল্লাস ও আনন্দ—শরতের। কাজ কর্ম্ম করিবার পাণ্ডা সে-ই। দু'বেলা বারোয়ারী তলায় কমিটী বসিতে লাগিল, যাত্রা হইবে কি থিয়েটার হইবে। যাত্রা হয় ত, কোন্ দল হইবে। বিসর্জ্জনটা নদীর ঘাটেই করা হইবে। এক কুড়ি বোমার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, আরও গোটা দশেকের দিতে হইবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর্থীর দিন ঠাকুর গড়ার কাজ পটুয়ার শেষ হইয়া গেল। এইবার মালাকরের সাজাইবার কাজ। ঠাকুর যাহা হইয়াছে—অতি চমৎকার। মাখনপুরের সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলিবে। সকলের মহা আনন্দ। সকলেই সুরেন গাঙ্গুলীর জয়-জয়কার করিতে লাগিল। কিন্তু—কিন্তু—হটাৎ সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল! পূজা Postponed (পোষ্টপোনড)!

সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর বুঝি সেদিন একটু গা গরম হইয়াছিল ও সেই সঙ্গে মাথা ধরিয়াছিল। তাহাতেই সুরেন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া বলিল—ম্যালেরিয়া! আর এখানে থাকা চলিবে না! সেই দিনই সুরেন স্ত্রীকে লইয়া একেবারে—মধুপুর রওনা হইল। যাইবার সময় সকলকে বলিয়া গেল, পূজা এখন মুলতুবী থাক, বড়দিনের সময় করে ফেলা যাবে। সকলে কহিল, সে কি কথা! পূজো কি কখনো বন্ধ রাখা যায়! আপনি চলে যাচ্ছেন, যান; পূজোটা আমরা করে ফেলি। সুরেন গাঙ্গুলী কহিল, তা কি হয়। যার আমোদের জন্যে এতগুলো টাকা আমার বাজে খরচ

হ'বে, সে অসুস্থ হয়ে পড়লো,—তার অবর্ত্তমানে কথনো পূজো হোতে পারে? কিছুতেই হবে না। ঠাকুর ত তৈরী হোয়েই থাকলো, বড়দিনের বন্ধে, বেশ ভাল করে জঁাকিয়ে পূজো করা যাবে। তথন সময়টাও ভাল, চারিদিক শুক্‌নো খট-খটে; তখন আমোদ পাওয়া যাবে। বলিয়া সুরেন গাঙ্গুলী স্ত্রীর ম্যালেরিয়ার দুর্ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তখনি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এই রকম সুরেন গাঙ্গুলীদের জন্যই কি দেশের পাপ আজ এমন কানায়-কানায় জমিয়া উঠিয়াছে, আর সেই পাপের জন্যই কি—আজ দেশের এই চরম দুর্গতি?

ভাবিলাম, এ দুর্গতির আর রেহাই নাই। কিছুতেই নাই। যে মহাপাপে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে পাঁচ মিনিটের ভূমিকম্পে সকলে রসাতলে যাইবে না; তিলে তিলে, একটু একটু করিয়া, এইভাবে যন্ত্রণা পাইতে পাইতে তাহা রসাতলে যাইবে।

বিয়ের এপিডেমিক

ক্ষুদ্র পরিবারটির মধ্যে ছিল তাহারা তিন জন; স্বয়ং নিশিকান্ত, তদীয় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী এবং ভাগিনেয়—শ্রীনটবর। নিশিকান্তের বয়স—৫০, তস্য অর্দ্ধ-অঙ্গের—কম-বেশ ৩০, এবং শ্রীনটবরের—২৫। নিশিকান্ত পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে, তাহার আয় ভোগ করে এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর বাক্য-যন্ত্রণা উপভোগ করতঃ অশান্তি এবং মনোবেদনায় দিনযাপন করে। সৌদামিনী গৃহকর্ম্ম করে, খায়-দায়, গল্পের বই পড়ে, বাপের বাড়ীতে চিঠি লেখে এবং স্বামীর অন্তরে কারণে-অকারণে খোঁচা মারে। পিতৃ-মাতৃহীন শ্রীনটবর মাতুলের অন্ন ধ্বংস করে এবং পর পর দুইবার আই. এ. ফেলের পর, বিয়ের অপেক্ষায় তাহার দিনগুলি উৎকণ্ঠার সহিত নীরবে অতিবাহিত করে। তাহার অন্তরের স্বপ্ন-রাজ্যকে সে গন্ধামোদিত বসন্তের বিকশিত পুষ্পরাজির দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছে। সেখানে সে তাহার স্বপ্ন-রাণীকে, স্বপ্নের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসায়, তাহার অলৌকিক রূপসুধা প্রাণ ভরিয়া পান করে, আর আনন্দে, তৃপ্তিতে, আবেশে তাহার সহিত কখনো, সাক্ষাতে, কখনো অসাক্ষাতে মনে মনে প্রেমালাপ করে।

নিশিকান্ত একটু সঙ্গীতপ্রিয়। প্রায় সর্ব্বদাই নিজের মনে সে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিয়া থাকে। এটা তাহার চিরকালের স্বভাব কিম্বা সৌদামিনী-সিঞ্চিত অশান্তি-বিষকে ধৌত করিবার আনন্দধারা, তাহা ঠিক বলা যায় না।

উক্ত স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, সেদিন কোন-এক মহাক্ষণে, যখন সে জুতায় বুরুস ঘষিতে ঘষিতে আপনমনে অনুচ্চস্বরে গাহিতেছিল—'ওরে মাঝি, তরী হেথা বাঁধিসনি ক আজকের সাঁঝে,' তখন পিছনের দরজার চৌকাঠ ধরিয়া দণ্ডায়মানা সৌদামিনীর কণ্ঠ হইতে প্রথমে এক ঝলক বিদ্রূপের হাসি ছিটকাইয়া পড়িল; তাহার পর নিশিকান্তের উদ্দেশে মোলায়েম বাক্য-বাণ নির্গত হইল—"ওটা মাঝি নয়, গাড়োয়ান হবে।—ওরে গাড়োয়ান! গাড়ী হেথা থামাস্নি ক আজকের সাঁঝে!"

খোঁচার অর্থটা সঙ্গে-সঙ্গেই নিশিকান্তর হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, যাহাকে সৌদামিনী জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই দেখে নাই; যাহার দেহ কৃশ কি স্থূল ছিল, সৌদামিনী কিছুই জানে না; যাহাকে সে ভালবাসিত কি ভালবাসিত না—সে বিষয়ে সৌদামিনীর কোন অভিজ্ঞতাই নাই, সেই-তাহার প্রথমা স্ত্রীর কোন সূত্র, কোন নাম-গন্ধ সে একেবারেই সহ্য করিতে পারিত না। মৃতা যে জীবিতাবস্থায় তাহার স্বামীর স্ত্রী হইয়া তাহার হৃদয় জুড়িয়া ছিল, ইহা যখন তাহার মনে উদয় হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সে বিষ, অন্য পাত্র অভাবে সে নিশিকান্তর উপরই নির্ব্বিচারে এবং অকাতরে ঢালিয়া দেয়।

সৌদামিনী কহিল—"সবই ত আমি শুনিছি। আগেকার শ্বশুরবাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও ত আর নদী নেই। ষ্টেসনে নেমে তিনচার কোশ পথ গরুর গাড়ী ক'রে যেতে হ'ত। তাই বলছি, ওটা হবে—গাড়োয়ান রে! গাড়ী হেথা থামাস্নি ক আজকের সাঁঝে!"

নিশিকান্ত নীরবে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া, তাহার জুতা-বুরুসের কাজে যেন অধিকতর মনঃসংযোগ করিল। মনে মনে ভাবিল—

উঃ! কি সাংঘাতিক! একখানা গান পর্য্যন্ত আমার গাইবার উপায় নেই! তবু গানের শেষের দিক্‌টা গাই নি,—সেই ঃ—

'ঐ ঘাটে—ঐ বকুলতলে, তটিনীর ঐ শ্যামল কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে!'

আর তা'র পরের অংশটা গাইলে, হয় ত বা আমাকে খুন করেই ফেলতো! সেই ঃ—

'এখনো সেই চিতার 'পরে, শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজও যে হায় মুখখানি তার, হৃদয়মাঝে সদাই রাজে॥'

ক্ষণেক নীরব থাকিবার পর নিশিকান্ত বলিতে যাইতেছিল যে, গানখানা কা'কেও মনে ক'রে সে গায় নাই; সুরটা খুব মিষ্টি তাই—,কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিল—"আগেকার বৌয়ের কথা মনে ক'রে ত গাইনি। তোমার বাপের বাড়ী নদীর ধারে কি না। তাই গানখানা গেয়ে প্র্যাক্‌টিস্ ক'রে রাখছি, একদিন ত গাইতেই হবে। তা বেশ, ও গান না হয় আর না-ই গাইব। এবার থেকে গাইব'খন—" বলিয়া নিশিকান্ত সহসা উচ্চতর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

মন রে! শেষের সে দিন ভাব।
যে দিন শঙ্কা ছেড়ে, ডঙ্কা মেরে, কলা দেখিয়ে যাব
রে মন! কলা দেখিয়ে যাব।"

গানের ঐ দুই ছত্রই নানা সুরে, নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে ক্রমাগত নিশিকান্ত গাহিয়া যাইতে লাগিল। তখন নিজেকে পরাজিতা মনে করিয়াও, অ-পরাজিতার ন্যায় সৌদামিনী, মুখখানাকে কালো করিয়া চাপা ব্যঙ্গের সহিত বলিয়া উঠিল—"আহা, বেশ! বেশ! বেশ!"—বলিয়াই আর তথায় দাঁড়াইল না, স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

তখন রাগে ও দুঃখে, নীরব নিশিকান্তর সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি যেন তাহার জুতা-বুরুস-কার্য্য-রত হাতের মধ্যে আসিয়া জমিয়া উঠিল। সে একান্তমনে এত জোরে জোরে তাহার জুতা ঘসিতে লাগিল যে, দামড়া গরুর শক্ত চামড়া না হইলে, নিশিকান্তর এই ভীষণ ঘর্ষণের ফলে তাহা এতক্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিত।

যখন নিশিকান্ত এইরূপ নিবিষ্টচিত্তে বুরুস দিয়া জুতা ঘর্ষণ এবং মুখের দ্বারা গুন্ গুন্ করিয়া তাহার মনকে 'শেষের সে দিনে'র কথা স্মরণ করানোর কাজে নিযুক্ত, ঠিক সেই সময় তাহার সম্মুখে ছায়া পড়িল এবং নিশিকান্ত মুখ তুলিয়া দেখিল—ভাগিনেয় শ্রীনটবর। নিশিকান্ত তাহার উদ্দেশে কহিল—"হ্যাঁ রে, সমস্ত সকালটায় কোথায় ছিলি? সংসারে যখন লক্ষ্মী ছাড়ে, তখন সকলকারই কি ছাড়ে?"

কথাটা দালানের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেও, যেন তাহা কোন অদৃশ্য 'লাউড্ স্পীকারে'র সাহায্যে রান্নাঘরের বাতাসে গিয়া বাজিয়া উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সৌদামিনীর ঘটনাস্থলে পুনরাবির্ভাব! সৌদামিনী খুব নম্র এবং মোলায়েম গলায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"লক্ষ্মীকে ছাড়লে কেন? ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে টেনে রাখতে পারনি?"

"এইবার রাখবো। শুধু ঠ্যাংয়ে দড়ি বাঁধা নয়; এবার খাটিয়া শুদ্ধু নিমতলার নিমগাছটায় টাঙিয়ে রাখবো।"

"আহা, এমন শুভদিন কবে হ'বে যে এ দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাব?"

"শীগগিরই হবে একদিন, তার যোগাড় হয়ে আসছে!" বলিয়া নিশি-কান্ত কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে বাহির বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ইহার পর বাড়ীর বাতাস দিন-তুই গরম হইয়া রহিল ; তারপর ক্রমশঃ তাহা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। এইরূপই হয়। নিশিকান্তর মনে কোন-কিছুর আঘাত স্থায়ী হয় না—ভিতরেও না, বাহিরেও না। বাহিরের তুঃখ-আঘাত ভুলিতে যদি বা কিছু দেরী হয়, ঘরের আঘাত সঙ্গে-সঙ্গেই সে ভুলিয়া যায়। এই স্থত্রে সে নিজের মনে বলে, 'জীবনে সহ্যই করিয়া যাই। এখানে কেহ যদি ইহাকে পরাজয় বলে, বলুক ; কিন্তু ভগবানের জমা-খরচের খাতায় জয়ের দিকেই এসব আমার জমা থাকবে।'

যদিও সৌদামিনীর অন্যায় ব্যবহারে নিশিকান্ত হঠাৎ রাগিয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর সে সদাপ্রফুল্ল, সদানন্দ। সৌদামিনীর বিষ কোন দিনই তাহাকে কাবু করিতে পারে না। বিবাহের পর এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল সৌদামিনী তাহাকে নানাপ্রকার খোঁচা দিতে বাকি রাখে নাই, কিন্তু নিশি-কান্তর অন্তর দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন দাগই সেখানে পড়ে নাই। তাই, তুই দিন না যাইতেই নিশিকান্ত সৌদামিনীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সহাস্য মুখে কহিল—"বিবিসাহেবের কি হয় গো ?"

সৌদামিনী পাণ সাজিতেছিল ; কহিল—"বাবু-সাহেবরা আহারান্তে পাণ চর্ব্বণ করবেন, তাই কাজ সেরে রাখছি।"

"বটে !"

"বটেই ত। এ বাড়ীতে শুধু ত খাটতেই এসেছি, খেটেই যাই। সে দিন কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ছিলুম—'রাঁধবার জন্যে একজন পাচিকা আর কাজকর্ম্মের জন্যে একজন পরিচারিকা চাই।' তা, এ সংসারে আমি হ'লুম ও তুই-ই। এখানে একটা হাত আমার পাচিকা, আর একটা হাত পরিচারিকা। ঝি একটা থাকতে হয় আছে, তার দ্বারা কি-ই বা কাজ হয় !"

নিশিকান্ত দেখিল, সুর সুবিধার নয়। সুতরাং ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

'মন রে! শেষের সেদিন ভাব।'

নটবর আসিয়া মামাবাবুকে কহিল—"ছুটো মঙ্গলবারের খরচ দিতে বাকী আছে ভটচায্যি মশায়কে ; তিনি চাইতে এসেছিলেন।"

নিশিকান্ত কহিল,—"ছুটো মঙ্গলবারের? তার মানে, ছু'টাকা দশ আনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"স্বামীর মঙ্গলের জন্যই তোমার মামীমা'র মঙ্গলবারের উপোস আর পূজো। সুতরাং নিশ্চয়ই ওটা দিতে হবে বৈকি। আবার কাল ত মঙ্গল বার। সুতরাং একেবারে চারটে টাকা দোবো, দিয়ে এসো।" বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতে আসিয়া নিশিকান্ত সৌদামিনীকে কহিল,—"তিন মঙ্গলবারের পূজোর খরচ ভটচায্যি মশায়কে দেয়া হয়নি ; পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ও-গুলো বরাবরই চলবে ত?"

চোখ ছু'টাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া সৌদামিনী কহিল,—"কোন্‌গুলো?"

"ঐ তোমার মঙ্গলবার আর পূর্ণিমে?"

"চালালেই চলবে ; না চালালে চলবে না। ও ত আর আমার নিজের মঙ্গলের জন্য করি না, ও করি—"

"আমার মঙ্গলের জন্য ; তা আমি জানি। এই রকম পতিব্রতা নারী—"

"কি বলছো?" সমস্ত মুখখানা সৌদামিনীর ফুলিয়া উঠিল।

কথাটাকে ঘুরাইয়া লইয়া নিশিকান্ত ঢোক গিলিয়া কহিল—"পতিব্রতা নারী ব'লে একখানা নতুন বই বেরিয়েছে, তাতে তোমার গিয়ে—বিশদ-

ভাবে যত সব—এই ধর—মূল, তত্ত্বার্থ এবং টীকা-টিপ্পনী, অনুশীলনী এবং—"

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সৌদামিনী চায়ের কাপ ডিসগুলা ধুইয়া আনিতে কল-তলার দিকে গেল এবং পরক্ষণেই হাত হইতে সেগুলির পড়িয়া ভাঙ্গিবার সুমধুর ঝন্ ঝন্ শব্দ নিশিকান্তর কাণে আসিতেই, সে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—'মন রে শেষের সে দিন ভাব।' এবং এক-পা এক-পা করিয়া বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া ডাকিল—"নটবর!"

আজ সকালে ভবানীপুর হইতে সৌদামিনীর মাসী ও মাসতুতো ভাই-বোনরা আসিয়াছিল। সারাদিন এখানে কাটাইয়া, আহারাদি, গল্প-গাছা ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, বৈকালের দিকে সকলে চলিয়া গিয়াছে। তাই আজ এক দিকে সৌদামিনীর মনটা যেমন সুপ্রসন্ন, অন্যদিকে নিশিকান্তর মনটা তেমনি অপ্রসন্ন। কারণ, মাসীমা'র দলবল আসিয়া আজ অধিষ্ঠান করাতে, শুধু যে তাহাদের ভোজন ব্যাপারে সাত টাকা সাড়ে তের আনা ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে; তা'ছাড়াও অনেক কিছুই হইয়াছে। টবের তিনটা গোলাপ গাছ ভাঙ্গিয়াছে, সার্সির দু'খানা কাচ গিয়াছে, বেড্-কভারখানা ছিঁড়িয়াছে, ফাউণ্টেন পেনের সোনার নিবটা ভোঁতা হইয়াছে, টেবলের উপর কালির ঢেউ খেলিয়াছে, সাবানের বাক্সটা নর্দ্দমায় গড়াইতেছে; আর সবের উপর, ছাতাটার কাপড় ও সিক উড়িয়া গিয়া তাহা ছড়ির আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু নিশিকান্ত তাহার মনের বিরক্তি বাহিরে প্রকাশ করিতে দিল না। সে তাহা চাপা দিয়া রাখিল এবং সহাস্য মুখে সৌদামিনীর সম্মুখে আসিয়া কহিল—"সই! দামিনী!"

নিশিকান্তর ইহা আদরের ডাক। এ আদরটা কিন্তু একটু শ্লেষমিশ্রিত।

সৌদামিনী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া কহিল—"কি হুকুম, বল।"

"আজ তোমার খুব পরিশ্রমটাই হয়েছে!"

"তোমারও কম হয় নি। ষ্টোভ্ জ্বেলে একটু চা ক'রে দি, খাও।"

"তুমি যখন ক'রে দেবে বলছ, তখন আমি কি 'না' বলতে পারি? কিন্তু আমিই ষ্টোভ্ ধরিয়ে তোমাকে একটু চা—"

চোখে মুখে একটা প্রসন্ন ভঙ্গীর সহিত গ্রীবা দোলাইয়া সৌদামিনী কহিল—"অত সুখ কি আমার ধাতে সইবে? তা'হলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিমতলার সেই নিমগাছেতে হয় ত ঝুলতে হবে।"—বলিয়া নিশিকান্তর চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

আজ অনেক দিনের পর, চা পান করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে রসালাপ জমিয়া উঠিল।

নিশিকান্ত কহিল—"আচ্ছা, তোমার কাণের নীচে গালের ওপর ওটা তিল না তাল?"

সৌদামিনী কহিল—"ওটা খেজুর। তিল বা তাল কি কখন লাল হয়—না ঐ রকম লম্বাটে ধরণের হয়?"

"তা হ'লে, চীনে খেজুর; কেন না—ছোট্ট, এক রত্তি।"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মাসীমার ছোট মেয়েটির নাম কি?"

"মালঞ্চ!"

"মালঞ্চই বটে! ভারি সুন্দর! যেন একটি গোলাপের মালঞ্চ!"

"পছন্দ হয়ে গেছে না কি? ঘট্‌কালি করব?"

"এ হৃদয়-আকাশে যে স্থির-সৌদামিনী তুমি বিরাজিতা, তাতে আর মালঞ্চের স্থান এখানে নেই।"

"যে অত সুন্দর ভালবাসে, তাকে বিশ্বাসও নেই।"

রসালাপের এই মধুর ক্ষণে নীচে শ্রীনটবরের গলা শুনিতে পাইয়া নিশিকান্ত কহিল—"সেই ভাত মুখে দিয়েই বেরিয়েছিল, আর এখন ফিরলো! কোথায় যে যায় তা ত বুঝি না।"

"সে ও বোঝে। এত বলি যে, ওর একটা বিয়ে-টিয়ে শীগ্‌গীর দিয়ে দাও, তা সেদিকে ত তোমার চাড় নেই। নিজেই শুধু টকা-টক্ বিয়ে করতে পার! নুটোর চেহারা দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে সেটা নজর করেছ?"

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া নিশিকান্ত কহিল—"যজ্ঞেশ্বর ষ্ট্রীটের সেই মেয়েটি, শুনেছি না কি খুব সুন্দর; তবে বয়স একটু বেশী।"

"কত?"

"তা তারা যখন বলছে ১৬।১৭, তখন ১৯।২০ ত হবেই। যাই হোক, মেয়েটিকে একদিন গিয়ে দেখে শুনে আসি।"

"যজ্ঞেশ্বর ষ্ট্রীটটা কোথায়?"

"বাগবাজারের দিকে; যেটার নাম আগে শ্যাক্‌রাপাড়া রোড ছিল, সেইটেরই এখন নাম হয়েছে—যজ্ঞেশ্বর ষ্ট্রীট।"

"যজ্ঞেশ্বর বুঝি খুব একজন বড় লোক ছিল?"

"ওরে বাবা! যজ্ঞেশ্বর রায় একজন কত বড় লোক! বাহাত্তর লাখ টাকা দেশের কাজে দান ক'রে গেছেন।"

"ছেলে-পুলে ছিল না বুঝি?"

"ছেলে-পুলে? বিয়েই করে নি মোটে।"

একটুখানি হাসিয়া সৌদামিনী কহিল—"তার পায়ের ধুলো তোমার নেওয়া উচিত ছিল। তা, অত বড় লোক, বিয়ে করে নি কেন গো?"

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া নিশিকান্ত যে গল্পটা বলিল, তাহা এই যে, যজ্ঞেশ্বর রায়ের বিয়ের জন্য তাঁহার জ্যেঠামহাশয় মেয়ে দেখিতে যান। কিন্তু মেয়েটিকে দেখিয়া, তাহার রূপে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, নিজেই তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন। সেই দুঃখেই যজ্ঞেশ্বর রায় জীবনে আর বিবাহ করেন নাই ; চিরকাল ভীষ্মের মত আইবুড়া অবস্থায় কাটাইয়া গিয়াছেন।

সৌদামিনী কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীচে হইতে ভাগিনেয় আসিয়া পড়াতে, তাহাকে জলখাবার দিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইল।

জলখাবার খাইয়া সেদিন সন্ধ্যার দিকে নটবর আর অন্য দিনের মত কোথাও বেড়াইতে বাহির হইল না ; বাড়ীতেই রহিল। তাহার মনটা আজ যেন বড়ই অপ্রসন্ন, মুখে মলিন ভাব। সমস্ত সন্ধ্যাটা সে নীরবে তাহার বিছানায় কাত্ হইয়া পড়িয়া রহিল। সৌদামিনী নিশিকান্তকে কহিল—"হ্যাঁগা, আজ ওর কি হ'ল বল দেখি? কোন অসুখ-টসুখ—"

"আরে না না! বোধ হয় সেই মেয়েটার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে আর কি! সে-ই দেখছি ওর মাথাটা খেলে!"

"তা তারই সঙ্গে না হয় ওর বিয়েটা দিয়ে দাও না ছাই!"

"হ্যাঃ! ঐ অদ্ভুত প্যাটার্ণের মেয়েকে ঘরে এনে শেষে নাকালের একশেষ হই আর কি। লেখা-পড়া শিখেছে—সেটা খুবই ভাল, কিন্তু ঐ রকম বেহায়াপনা আমি দু'চক্ষে দেখ্তে পারি না।"

রাত্রে সকাল-সকাল, সকলের আগে খাইয়া লইয়া, নটবর উপরের বারান্দায় গিয়া শুইয়া পড়িল। গরমের জন্য সে কয়দিন হইতে ঘর ছাড়িয়া সেইখানেই শুইতেছে। মধ্য রাত্রে সৌদামিনী নিশিকান্তর গা

ঠেলিয়া তুলিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"নুটো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি বকছে বল দেখি ?"

নটবর তখন জড়িতস্বরে বলিতেছিল—"লতা লতা ! তুমি যদি আমাকে জড়িয়ে না ওঠো, তুমি যদি নিদয়া হও, পাষাণী হও, তা হ'লে——"

সৌদামিনী কহিল—"ও সব কি বলছে ও ?"

"স্বপ্ন দেখছে আর কি, বুঝতে পাচ্ছ না ? ওই লতিকাটাই ওর মাথাটা খাবে নয়—দেখছি, খেয়েই ফেলেছে !"

শ্রীনটবর সেইরূপই বকিয়া যাইতে লাগিল—"তুমি রাগ কোরো না, লতা ; আমার ঘাট হয়েছে ! তুমি ও-রকম করলে আমি আফিং খাব, আমি আত্মহত্যা করব !"

নিশিকান্ত একটা টানা শ্বাস ফেলিয়া কহিল—"হয়েছে ! ভেতর ভেতর ওর ব্যাধি দেখছি অনেকটা এগিয়েছে !"

সৌদামিনী কহিল—"কতদিন থেকে বলছি যে, ওর একটা বিয়ে আগে দিয়ে দাও, তা সে কথায় ত আর কিছুতেই কাণ দিচ্ছ না !"

শ্রীনটবর পুনরায় বিড়্ বিড়্ করিয়া কি সব বকিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন বৈকালের দিকে জামা-কাপড় পরিয়া নিশিকান্ত আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ঠিক করিতে করিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

'এই নদীর ঐ পথটি দিয়া,
এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসীটিকে—
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথলে উ——'

সহসা চমকের সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ বাড়ীতে এইটি নিষিদ্ধ সঙ্গীত; সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে উহা পরিত্যাগ করিয়া, গাহিতে সুরু করিল—

কোন্ বাঁশীতে বাজাও প্রভু কোন্ রাগিণী,
ছোটে আমার মরুর বুকে মন্দাকিনী!

কিন্তু মন্দাকিনীর পরিবর্ত্তে সৌদামিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্য ছুটিয়া নয়, ধীরে ধীরেই আসিল। আসিয়া কহিল—"সেজে-গুজে যাওয়া হবে কোথায় গো?"

সামনের আয়নাতে সৌদামিনীর ছায়া পড়িয়াছিল। নিশিকান্ত মুখ না ফিরাইয়া যেমন গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল, তেমনি গাহিয়া যাইতে লাগিল—

পথটি প্রভু চিনিয়ে দিও, হাতটি আমার ধরে নিও,
আঁধার মাঝে ছুটবো প্রভু, তোমার সুরের পাছে পাছে।

গানটির মধ্যে কোথাও 'প্রভু' কথাটা নাই। ইহা নিশিকান্তেরই যোগ করিয়া দেওয়া এবং ঐ কথাটার উপরই সুরের যে একটা জোর ও ঝোঁক, তাহাও তাহার ইচ্ছাকৃত।

সৌদামিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"এত সাজের বাহার, কোথায় যাওয়া হবে?"

নিশিকান্ত যেন চমকাইয়া উঠিল—"কে? সই! দামিনী?"

সৌদামিনী এবার একটু হাসিল। হাসিটা কিন্তু সরল ও স্বচ্ছ নহে।

নিশিকান্ত বলিল,—"সেই মেয়েটিকে একবার দেখে আসি।"

"কোন্ মেয়েটিকে?"

"যজ্ঞেশ্বর ষ্ট্রীটের। শুনিছি মেয়েটি পরমা সুন্দরী; কিন্তু তা' হ'লেও একবার—"

"দেখার দরকার; কিন্তু তোমার গিয়ে দেখে আসবার দরকার নেই। জামা-কাপড় খুলে ফেল।"

নিশিকান্ত কহিল—"এ কথার মানে?"

"মানে-টানে জানি না, তুমি যেতে পারবে না।—হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কি? বলি, তুমি ত আর বিয়ে করবে না; যে করবে, সেই দেখে আসবে। আজকাল তাই ত সকলে করে।"

তথাপি নিশিকান্ত হাঁ করিয়াই খানিকক্ষণ চাহিল রহিল এবং এই খানিকক্ষণের মধ্যেই সৌদামিনীর আসল কথাটা বুঝিয়া ফেলিল। কহিল —"তা হ'লে যাব না?"

"না।"

"পাছে যজ্ঞেশ্বর রায়ের জ্যেঠার মত কাজটা ক'রে ফেলি?"

একটু বিরক্তি এবং একটু শ্লেষের সহিত সৌদামিনী কহিল—"অসম্ভব নয়। কেন না, যে চল্লিশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করতে পারে, সুন্দরী মেয়ে পেলে সে পঞ্চাশেও আবার একটা পারে।"

মনে মনে নিশিকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইল। সে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল—"তা পারে বটে, কিন্তু আমি কি করব বলে ঠিক করেছি জান? এখন আমার পঞ্চাশ চলছে; আর ক'টা মাস পরে—অর্থাৎ পঞ্চাশোর্দ্ধে—বনং মাঝে যাব।" বিকট চিৎকারের সঙ্গে নিশিকান্ত তাহার শেষ কথা কয়টি বলিল।

সমান ওজনে সৌদামিনীও বলিল—"যেখানে যেতে হয় যেও, এ মেয়ে তুমি দেখতে যেতে পাবে না।"

"আলবৎ যাব।"

চীৎকার করিয়া সৌদামিনী কহিল—"আলবৎ যেতে পাবে না।"

"যাব ত ঠিকই। বরং তার আগে সেই 'ওরে মাঝি'র গানখানাও গাইব।" বলিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিশিকান্ত হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া বসিল।

সৌদামিনী ক্ষিপ্তের মত হইয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া, জলভরা গড়-গড়াটা দুই হাতে ধরিয়া, তাহার দ্বারা হার্ম্মোনিয়মের উপর এমন জোরে আঘাত করিল যে, তাহার উপরের কাঠ, পর্দ্দা, ষ্টপার সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখন নিশিকান্ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, আলনায় সৌদামিনীর যে দামী সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ প্রভৃতি ছিল, তাহা ফালা-ফালা করিয়া সব ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং মত্তের মত কম্পিত কলেবরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল—"সাতটা বিয়ে করব! দেখি তুমি কি করতে পার! আজ এই বাড়ী ছেড়ে চল্লুম, সাত বউ নিয়ে ফিরবো।"

দশ বৎসরের মধ্যে নিশিকান্তর এমন রাগ ইহার আগে সৌদামিনী আর কোনদিন দেখে নাই। সে ঘরের মধ্যে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিশিকান্ত বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসে নাই। আরও সাতদিন কাটিয়া গেল, ফিরিয়া আসিল না। সৌদামিনী গোপনে গোপনে নানা স্থানে সন্ধান লইয়াছে, কিন্তু কোন সংবাদ পায় নাই। তাহার মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইল। স্বামীর প্রতি অপ্রিয় ব্যবহারের জন্য অনুশোচনাও আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনো নিশিকান্তর প্রতি সে কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিবে না।

বাড়ীতে প্রত্যহ 'দৈনিক বসুমতী' আসিত। দুপুরবেলা আহারাদির পর সৌদামিনী কাগজখানা লইয়া তাহার বিছানায় গিয়া শুইত, আর তাহা পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া যাইত। সেদিন কাগজে একটা খবর পড়িয়া সে চমকাইয়া উঠিল; তাহার আসন্ন ঘুম ছুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া নটবরকে ডাকিল।

সংবাদটা ছিল এইরূপ—

'গত বুধবার রাত্রে এই সহরে একটি অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ৫২ নং তারাবাঈ রোড নিবাসী এক ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ঐ দিন রাত্রে এক ষোড়শী যুবতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং তাহাদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া, ঐ কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছে। এই শ্রেণীর বিবাহ-পাগল ব্যক্তি যে আজও সমাজে বর্ত্তমান, বাস্তবিক ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, বৃদ্ধটির পূর্ব্ব স্ত্রীও না কি বর্ত্তমান।'

সৌদামিনী নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তারাবাঈ রোডটা কোথায় রে?"

"কেন, মামীমা?"

"একটু দরকার আছে।"

"সেটা হোল শ্যামবাজারের দিকে; সার্কুলার রোড থেকে বেরিয়েছে।"

"একখানা ট্যাক্সি ক'রে আমাকে ৫২ নং তারারাঈ রোডে নিয়ে যেতে পারবি?"

"খুব পারব। এখনি?"

"হ্যাঁ। আমি কাপড়টা ছাড়ি, তুই ততক্ষণ একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন্।"

নটবর ট্যাক্সি ডাকিতে গেল।

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সৌদামিনী ভাবিতে লাগিল—আমার ওপর রাগ ক'রে সত্যিই কি শেষে—? তা' যদি ক'রে থাকে, তা' হোলে আজ রাত্রেই আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করবো! উঃ! এই বয়সে আমার ওপর আড়ি ক'রে একটা ১৫।১৬ বছরের মেয়েকে—! আত্মহত্যা ত করবই! কিন্তু তার আগে, ঐ ৫২ নম্বরেতেই কুরুক্ষেত্র একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বাড়ী ফিরব!

নটবর ট্যাক্সি লইয়া ফিরিল। সৌদামিনী নটবরকে লইয়া ট্যাক্সিতে গিয়া বসিল।

৫২ নং তারাবাঈ রোডের সামনে ট্যাক্সি থামাইয়া নটবর নামিয়া পড়িল এবং দেখিল, একটি কাল রংয়ের খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ লোক বাহিরের ঘরে বসিয়া একটা খেলো হুঁকায় ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া এক মনে তামাক খাইতেছে। লোকটির মাথার চুল না পাকিলেও, গোঁপের সব চুলেই সাদা রং ধরিয়াছে। দাড়ী কামানো, বুকে এক বুক চুল; তাহাও কাঁচায় পাকায় মিশানো। ঠোঁট এবং নাকের ডগাটা অসম্ভব মোটা। পরণে একখানা কোরা আট-হাতি লালপাড় ধুতি; স্থানে স্থানে তাহাতে হলুদের ছোপ।

তাহার সম্মুখে আসিয়া নটবর জিজ্ঞাসা করিল—"এইটেই ত ৫২ নং বাড়ী?"

বুড়া লোকটি কহিল—"হঃ, বায়ুন্ন নম্বর।"

"কার বাড়ী এটা?"

"কেন? আমার নিজেরই বাড়ী। বছর এগারো অইলো, সারে এগারো হাজার টাহা দিয়া কিন্ছি। কিন্তু আপ্নে আমারে এ কথাডা জিগাইছেন ক্যান্?"

"দেখুন, আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে আমার মামীমা এসেছেন। এ বাড়ীতে সম্প্রতি কি কারও—"

"আপ্নের মামী আইছেন? চলেন—চলেন, দেখ্যা আইসি।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধটি নটবরের হাত ধরিয়া টানিয়া ট্যাক্সির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল—"আপ্নে বদ্দর মহিলা; কষ্ট কইরা আইলেন, কি জান্‌তি চান, কয়েন। ঐ আমার বিয়ার কথা তো? আপ্নে বদ্দর লোকের মাইয়ে, আপ্নে বিচার কইরা কয়েন, কি অন্যায়ডা করচি; কি অপরাধডা আমার অইছে! খবরের কাগজওলারা যে—"

বাধা দিয়া নটবর কহিল—"শুনুন আপনি; এই বাড়ীতে নিশিকান্ত বাবু ব'লে কেউ আছেন কি?"

"নিশিকান্ত? নিশিকান্ত ত নয়; ছিলো বটে কামিনীকান্ত—মোর বড় ছাওয়াল, তা আমার এই বিয়ার কথা শুন্যা হে-ও রাগ কইর‍্যা, তাগোর পোলাপান্ লইয়্যা চইলা গ্যাছে। আরে আপ্নে বলেন দেহি, কি অন্যায়ডা আমার অইলো! এই বুরা বয়েসে, মোশয়, আমার গরের মাইয়্যালোকের গেল মাথা খারাপ অইয়ে; কয়েন তো, আমারে এ সময়ে কেডা দেহা-শুনা করে? আমি বিয়া কর্‌ছি দেক্‌থ্যা কাগোজে কাগোজে যে সব ঢোল পিটায়, কিসের লাগি?"

গাড়ীর ভিতর হইতে সৌদামিনী অনুচ্চকণ্ঠে নটবরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"জিজ্ঞাসা কর্ না, যার বিয়ে হয়েছে তার নাম কি?"

"আরে, বিয়া ত অইছে আমারোই। তা নাম লইয়্যা আর কি অইবো, কয়েন। নাম ত আমার—পেরাণবল্লভ,—পেরাণবল্লভ পাল। আপ্নেরও তা অইলে কোনো কাগজ-টাগোজ আছে। মনে অয়, আপ্নে কোনও মায়েকাগোজের—কি বলে কথাডাকে—ওডিটুর। হব্ কাগজেই তো

ছাপায়ে গ্যাছে, গ্যায়েন, আপ্‌নেও গ্যায়েন্! কল্‌কাতা সহরে বিয়া করলে যে এত বোগাস্তি বুগ্‌তি হয়, এডা জানা থাকলে কি আর সারে এগারো হাজার টাহা খরচ কইর‍্যা এহানে বারী কিন্‌তাম!"

অতঃপর সৌদামিনী আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া নটবরকে গাড়ীতে উঠিতে বলিল।

মাতুলানী এবং ভাগিনেয় 'সীট'এর দুই প্রান্তে দুই জন নীরবে বসিয়া থাকিয়া দুইটি বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। সৌদামিনী ভাবিল, —"তাই ত মনে করেছিলুম, এতটা কি কখনো করতে পারে! যা'ক, একটা ধুঁক্‌-পুকুনি গেল। কিন্তু আজ পনর-ষোল দিন হ'য়ে গেল, কোথায় যে ডুব দিয়ে থাকলো!" এদিকে শ্রীনটবর ভাবিতে লাগিল— "মামীমার জন্তে সব মাটী হয়ে গেল আজ! লতিকাকে নিয়ে আজ তিনটের শো'তে সিনেমায় যাবার কথা ছিল, সব নষ্ট হয়ে গেল! এখন গিয়ে কি আর টিকিট কিনে যায়গা পাব?"

মোটের উপর উভয়ের 'একযাত্রায় পৃথক্ ফল' ফলিল। এক জন হইল প্রসন্ন, অপরে হইল অপ্রসন্ন।

হঠাৎ একদিন সৌদামিনীর নাম বরাবর খামে-আঁটা এক পত্র আসিল। খামখানি খুলিতেই দেখা গেল, তাহা কোন পত্র নহে। হাঁ, পত্রই বটে। লাল কালিতে ছাপা,—প্রজাপতি মার্কা, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। তাহাতে লেখা আছে:—

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

কলিকাতা, ৪।১ কানাই নিয়োগী লেন নিবাসী শ্রীমান্ নিশিকান্ত দত্তের সহিত, আগামী ২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার আমার সপ্তমা কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাসীর শুভ-পরিণয় হইবে। অতএব মহাশয় উক্ত দিবস সবান্ধবে মদীয়

শান্তিপুরস্থ ভবনে শুভাগমনপূর্ব্বক বিবাহোৎসবে যোগদান করতঃ আমাদের আনন্দসাগরে ভাসাইবেন। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি।

বিনীত
শ্রীমদনমোহন মিত্র
কেয়ার অব শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চ্যাটারজী
পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া)

চিঠিখানা সৌদামিনী একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল। পড়িয়া খানিক ভাবিল। তার পর মনে মনে খুব খানিকটা হাসিয়া মনে-মনেই বলিল—"চালাকীটা করতে গিয়ে চল্‌লো না, ধরা পড়ে গেল। 'মদীয় শান্তিপুরস্থ ভবন' আবার 'কেয়ার অব অন্নদাপ্রসাদ'। তার মানে, মদন-মোহনও ভুয়ো, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীও ভুয়ো, আর শুভ পরিণয়ও ভুয়ো; খাঁটি শুধু, বোধ হচ্ছে—ঐ 'কেয়ার অফ'টি। যাক্, পাত্তাটা তবু পাওয়া গেল; বাঁচলুম বাবা! নুটোকে এইবার সেখানে—নাঃ, আমিও একটা পাল্টা চাল চালি।"

পরদিন ভবানীপুর হইতে সৌদামিনীর মাসতুতো ভাই কমলেশ এবং তাহার সঙ্গে আর একটি যুবক এ বাটীতে আসিল। যুবকটিকে দেখিয়া সৌদামিনী সানন্দে বলিয়া উঠিল—"কে রে, রাধিকা?"

রাধিকা বলিল,—"হ্যাঁ দিদি। এগার বছর পরে তোমায় দেখলুম; আর এক বছর হ'লে, এক যুগ পুরো হ'ত।"

রাধিকা সৌদামিনীর মামাতো ভাই; তাহার বড় মামার ছেলে।

'উই আর সেভেন্'

কলিকাতা হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর রাধিকাকে নাগপুরে তাহার খুড়ার কাছে গিয়া পড়াশুনা করিতে হয়। সেইজন্য সৌদামিনীর বিবাহের সময় সে আসিতে পারে নাই। তাহার পরই সে খুড়ার নিকট হইতে পালাইয়া আমেরিকায় যায় ও সেখানে কয় বৎসর থাকিয়া ফিল্মের কাজ-কর্ম্ম শেখার পর, বৎসর-দুই হইল বোম্বাইয়ে এক ফিল্ম কোম্পানীর ডাইরেক্টরী চাকুরী লইয়া ফিরিয়া আসে। বোম্বাইয়ে থাকা কালে রাধিকা একটিবার মাত্র দেশে আসিয়াছিল, কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে এগার বছর পরে এইবারই তাহার প্রথম দেখা।

সৌদামিনী কহিল,—"যা'ক, দেশে যে ফিরে এসেছিস্ ভাই, এই ঢের। তোকে যে আবার আমরা দেখ্‌তে পাব, তা ভাবি নি।"

রাধিকা সৌদামিনীর অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু খুবই চালাক, চতুর এবং তাহার স্বভাবটি সদা-প্রফুল্ল। রাধিকা কহিল,—"তোমাকেও দিদি যে আবার দেখতে পাব, তা আশা করি নি। যিনি তোমাকে আমাদের বাড়ী থেকে এক রাতের মধ্যে চুরি ক'রে এনেছিলেন, আমাদের সেই ভগ্নীপতি মশাইটি কোথায়?"

"শান্তিপুর।"

"শান্তিপুর? কেন দিদি?"

"কাপড়ের ব্যবসা খুলবে, তাই তাঁতিদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর্‌তে গেছে।"

"ওখানা কি দাদারই এন্‌লার্জমেণ্ট ঝুল্‌ছে?"

"হ্যাঁ।"

"দাদা ত আমাদের খুব ভাল দাদা হয়েছে, দিদি। তিনি শান্তিপুর থেকে ফিরবেন কবে?"

"২১শে জ্যৈষ্ঠির পর। ২১শে সেখানে তাঁর বিয়ে।"

রাধিকা লাফাইয়া উঠিল, কহিল—"বিয়ে ?" বলিয়া সবিস্ময়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

শান্তিপুরে সকাল বেলা বাহির বাটীতে বসিয়া অন্নদা বাবু নিশিকান্তর সহিত গল্প-গাছা করিতেছিলেন। কোট-প্যান্টপরা একটি গৌরবর্ণ, ছিপ্-ছিপে যুবক একটি 'এটাচি কেশ' হাতে ঝুলাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নমস্কার জানাইয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। অন্নদা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোত্থেকে আসছেন ?"

যুবকটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল, "কলকাতা থেকে আসছি; হরিদ্বার তীর্থ-যাত্রী 'স্পেশ্যালের' রিপ্রেজেনটেটিভ্ আমি। আমাদের মত সুবন্দোবস্ত আর কোথাও পাবেন না। বিদেশে আপনি 'হোম্ কমফর্ট' পাবেন। আর ভাড়াও খুব কম। যদি আপনারা কেউ—

অন্নদা বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—"আপনি এঁর সঙ্গে কথা ক'ন, উনি হয় ত গেলেও যেতে পারেন; আমার ভাগ্যে, এ বাড়ীর ঐ সদরদ্বার 'টু' খিড়কী দ্বার, তার বেশী আর কোন দ্বার হয়ে ওঠা অসম্ভব।" বলিয়া অন্নদা বাবু ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

যুবকটি কহিল,—"আর ১৫ দিন পরেই আমাদে 'স্পেশ্যাল' ছাড়বে। বহু যাত্রী 'বুক' ক'রে ফেলেছেন। এর আগে আমাদের "স্পেশ্যাল" একবার কাশ্মীর, একবার সেতুবন্ধ-রামেশ্বর গিয়েছিল। বড় বড় লোকের টেষ্টিমোনিয়াল আছে।"

নিশিকান্তর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু যুবকটিও না-ছোড়-বান্দা; ক্যান্‌ভাসিংএর কাজে ভীষণ দক্ষ এবং পরিপক্ক। যুবকটি কহিল—

"আর অল্প কয়েকটা 'সীট্' বাকী আছে মাত্র। অনেক বড় বড় লোক টিকিট কিনেছেন"—বলিয়া একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া নিশিকান্তর সম্মুখে ধরিল। কহিল—"এই দেখুন—রায় বাহাদুর কমলকৃষ্ণ মিত্র, এঁরা স্বামি-স্ত্রী দুজনেই যাচ্ছেন। তার পর এই দেখুন—নন্দলাল গুহ, ইনি মস্ত এক জন কনট্রাক্টার। এই যে দেখছেন—মতিলাল মল্লিক, ইনি ধনকুবের বল্লেই হয়, তবু ইনি আমাদের স্পেশ্যালেই যাচ্ছেন।"

নিশিকান্ত খাতায় লিখিত নামগুলা পড়িয়া পড়িয়া দেখিতেছিল। যুবকটি কহিল—"এই যে ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, এঁর নাম শুনেছেন নিশ্চয়, হাইকোর্টের নাম-করা উকীল, ইনি সাতখানা টিকেট কিনেছেন।"

হঠাৎ একটা নাম দেখিয়া নিশিকান্ত চম্‌কাইয়া উঠিল। কহিল—"এই যে ৪।১ কানাই নিয়োগী—

যুবকটি কহিল—"৪।১ কানাই নিয়োগী লেন—হ্যাঁ, শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী। উনি একখানা টিকেট কিনেছেন, তাও শুধু যাবার। উনি আর ফিরে আসবেন না, ঐখানেই থেকে যাবেন। ওঁর—"

নিশিকান্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাহার মুখের মধ্যে যেন অনেক কথা জমিয়া আসিল, কিন্তু বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যেন সব মুখের মধ্যেই আটকাইয়া রহিল। শুধু কহিল—"সৌদামিনী দাসী? ৪।১ কানাই নিয়োগী লেন? ইনি টিকিট্ কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে, ঐ যে বল্লুম, উনি খালি যাবেন, ফিরে আর আসবেন না। কালই সকালে উনি টিকিট কিনেছেন।"

"তা উনি আর ফিরে আসবেন না কেন?"

"তা বলতে পারি না। ভদ্র-মহিলা, সে সব কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি, করা উচিতও নয়। এই দেখুন—"

বাধা দিয়া নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"কবে ছাড়বে আপনাদের গাড়ী ?"

"২রা আষাঢ় ।"

* * * * *

ঐ দিনই সন্ধ্যার পর নীচের দালানে বসিয়া সৌদামিনী কি-একটা সেলাইয়ের কাজ করিতেছিল। নটবর কাল হইতে বাড়ী নাই। কোথায় গিয়াছে, কিছুই বলিয়া যায় নাই। সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সৌদামিনী নটবরের কথাটাও ভাবিতেছে। সহসা সদর দরজার কড়া খুব জোরে নড়িয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সৌদামিনী গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ?"

"আমি।"

"আমি কে ?"

"আমি গো ! খোল না শীগ্‌গির।"

"নাম না বল্লে খুলবো না।"

"আঃ ! আমি নিশিকান্ত।"

সৌদামিনী দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল,—"আজ ২১শে, তোমার বিয়ে না ?"

"হ্যাঁ, তাই ত এলুম"—বলিয়া নিশিকান্ত পরাজিতের ন্যায় গ্লানি মন্থর পদবিক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরদিন সকালে সৌদামিনী নীচের দালানে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। নিশিকান্ত হাত-কয়েক দূরে বসিয়া পূর্ব্বেকার মত জুতায় বুরুস ঘসিতে ঘসিতে গুনগুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল। তবে সেদিনের মত সেই

'ও রে মাঝি' অথবা 'মন রে, শেষের সে দিন' গান নিশ্চয়ই নয়। বুরুস দিতে দিতে নিশিকান্ত কহিল,—"রাধিকাকে বলিহারী যাই! খুব জবর ভাইটি তোমার কিন্তু! তীর্থযাত্রী স্পেশালের খাঁটি এজেন্ট! ওঃ! আচ্ছা ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিল। ওকে একটা মেডেল দিতে হবে।"

"তা ত দিতে হবে; কিন্তু মুটোর ব্যাপারটা কি? আজ তিনদিন হ'ল সে বাড়ী ছাড়া, গেল কোথায়?"

"তাই ত ভাবছি। সেই মেয়েটাকে নিয়ে লেকে-টেকে গিয়ে ডুবলো, না—আফিং-টাফিং কিছু খেলে!"

সৌদামিনী কহিল—"আমার পরামর্শ ত কিছুতেই তুমি শুনবে না। নিজেই খালি বিয়ে করছ! ত্ব' ছুটো বিয়ে করেও আবার শান্তিপুরের শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীকে বিয়ে করবার যোগাড় কচ্ছিলে, কিন্তু—"

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ হওয়াতে নিশিকান্ত ফিরিয়া দেখিল—স্বয়ং ভাগিনেয় শ্রীনটবর এবং তস্য পশ্চাতে বধূবেশে শ্রীমতী লতিকা।

মাতুলকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়াই নটবর টিপ্ টিপ্ করিয়া মাতুল-মাতুলানীর পায়ে গড় করিল এবং লতিকার দিকে চাহিয়া কহিল—"মামা-মামীমাকে প্রণাম কর।" তার পর ঘাড় হেঁট করিয়া নিশিকান্তর উদ্দেশে কহিল,—"অনেকবার অনেক অপরাধই করেছি, সবই ক্ষমা করেছেন, আমার এ অপরাধও—"

বাধা দিয়া নিশিকান্ত কহিল, "তুই কি বিয়ে ক'রে এলি?"

নিরুত্তরে শ্রীনটবর ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবালয়।

সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ার শঙ্খ-রোলকে চাপা দিয়া শ্রীরাম ঘোষের বাড়ী কলহের রোল উঠিল।

কলহটা—পিতা এবং পুত্রে। কলহের কারণ—শ্রীরামের প্রথম এবং শেষ পুত্র শিবনাথ আজ সাত মাস যাবৎ বকুলহাটির স্কুলে মাষ্টারী করিয়া মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু এ যাবৎ সাতটি পয়সাও বাপের হাতে দেয় নাই। প্রতি মাসেই এই লইয়া পিতা-পুত্রে গোলমাল বাধে। কিন্তু আজিকার ব্যাপার অন্যান্য বারের তুলনায় একটু গুরুতর।

বৃদ্ধ শ্রীরামের পক্ষে রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, একমাত্র পুত্রটিকে সে সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যেও খরচপত্র করিয়া আই. এ. পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী বকুলহাটির বাবুদের বাটী দুইবেলা হাঁটা-হাঁটি করিয়া, অশেষ প্রকারে বাবুদের ধরিয়া-কহিয়া, তাঁহাদের স্কুলে তাহার কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। শ্রীরামের মনে বড় আশা ছিল যে, তাহার কষ্টের সংসারে, শিবনাথের উপার্জ্জনের অর্থ, অনেক কষ্ট লাঘব করিবে। কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। শিবনাথ যে ত্রিশটাকা করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহা ত্রিশ দিনের মধ্যেই সে পোষাকে-পরিচ্ছদে, আমোদে-প্রমোদে, এবং বিলাসে অপব্যয় করিয়া ফেলে। দরিদ্র ঘরের ছেলে হইলেও সে চাল-চলনে বড় লোকের ছেলেদের মত থাকিতে চায়। সেই জন্য চারিখানি ধুতির স্থলে তাহার তেরখানি ধুতি, হরেক রকমের কুড়িখানেক জামা, চারি পাঁচ জোড়া জুতা, ছড়ি, চশমা, রিষ্টওয়াচ্, গোটা-তিনেক ফাউণ্টেনপেন, ক্রীম, ক্যাষ্টর-অয়েল, টুথ্-ব্রাস, হেয়ার-ব্রাস,

স্নো, টর্চ্চ, ফ্লাস্ক প্রভৃতি তাহাকে সর্ব্বদাই বেষ্টন করিয়া রাখিত। এতদ্ভিন্ন—প্রতি শনি এবং রবিবার, ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া, ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতায় যাওয়া এবং সিনেমা প্রভৃতি দেখা তাহার চাই-ই। তারপর হেয়ার-কাটার আছে, রেস্তোঁরা আছে, ট্রাম আছে, বাস আছে, গ্রামের ক্লাব আছে, লাইব্রেরী আছে, ইত্যাদি আছে। সুতরাং ত্রিশ টাকা কোন্ ছার, দক্ষরাজের রাজত্ব পাইলেও তাহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, শিবু দরিদ্র পিতাকে এক পয়সাও সাহায্য করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

কিন্তু শ্রীরাম—মূর্খ শ্রীরাম—বৃদ্ধ শ্রীরাম—ভীমরতিগ্রস্ত শ্রীরাম, পুত্রের এই ব্যবহারটাকে ঘোরতর অন্যায় বলিয়া এতদিন ধরিয়া আসিতেছিল এবং সাত মাসের দুঃখ ও গ্লানিকে সহিষ্ণুতার যে আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা একেবারেই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এই দণ্ডেই দূর হয়ে যা, পাজী, শূয়ার, নেমকহারাম, ষ্টুপিড কোথাকার!"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে বকাবকি যখন চরমে গিয়া পৌঁছিল, তখন শ্রীরামের বিধবা ভগিনী সুখদা আসিয়া ক্রোধ-কম্পিত ভ্রাতাকে জোর করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইল এবং কন্যা বাতাসীকে তাহার মামার জন্য এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিল। শ্রীরাম ভগিনীকে ঝাঁজি দিয়া কহিল,—"তামাক সেজে আন্‌বে ও কোত্থেকে? পয়সা-কড়ি ছিল না ব'লে আজ কি আর তামাক আনতে পেরেছি, না সারাদিন একছিলিম তামাক খেতে পেয়েছি?"

কন্যার দিকে চাহিয়া সুখদা কহিল,—"তোর দাদা যে সিগেরেট খায়, ও-ঘর থেকে তাই একটা না হয় এনে দে না, মা।"

শ্রীরাম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"ও শুয়োরটার জিনিষে আমি,—তুই যা বাতাসী, তোর কাজ করগে যা।"

উঠানের একাংশে তখন শিবু গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একহাতে একগাছা 'চেরীর' ছড়ি, আর এক হাতে টর্চ্চ। পায়ে ক্রোকোডাইল লেদারের স্যাণ্ডেল, গায়ে পাফ্‌লিনের পাঞ্জাবী। সন্ধ্যার চা-পানের পর সে তাহাদের 'কার্ত্তিকপুর বিজলী ক্লাবে' যাইতেছিল,—এহেন সময়ে ইত্যাকার বিপত্তি।

শিবু খিড়কীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কাঁটালগাছটার দিকে হাতের টর্চ্চটা তুলিয়া, তার বোতামটা একবার টিপিয়া ধরিল। তারপর ছড়িগাছটার প্রান্তভাগ দিয়া উঠানের মাটীর উপর দুই চারিবার ঠকা-ঠক্ ঠোকা মারিল। তারপর কিছুক্ষণ উঠানমধ্যে ইতস্ততঃ পাইচারি করিল। অবশেষে শীস্ দিতে দিতে ও ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'কার্ত্তিকপুর বিজলী ক্লাবের' উদ্দেশে বহির্গত হইয়া গেল।

সেই মাসেই শিবুর 'ঘুঘুর বাসা' পুড়িয়া গেল,—অর্থাৎ বকুলহাটি হাই স্কুল হইতে তাহার চাকুরী খতম হইয়া গেল।

বকুলহাটি জমীদার-বাড়ীর যিনি মেজ বাবু, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বিচারপরায়ণ। শিবু যে তাহার দরিদ্র পিতাকে এক পয়সাও সাহায্য করে না এবং তৎপরিবর্ত্তে সমুদয় অর্থ বিলাস-বাবুগিরিতে অপব্যয় করে, এই সংবাদ যথাসময়ে তাঁহার কাণে পৌঁছিয়াছিল। তিনি মাস দুই তিন

পূর্ব্বে, হেড মাষ্টারকে দিয়া শিবুকে জানাইয়াও ছিলেন যে, শ্রীরামের সাহায্যের জন্যই তাহাকে স্কুলের চাকুরী দেওয়া। সে যদি শ্রীরামকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহার স্কুলের চাকুরী থাকিবে না। তাহার পর সে-দিনের ঘটনার কথা যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখনই তিনি তাহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই ব্যবস্থার ফলেই আজ শিবুর অবস্থা—'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

সুতরাং শিবু স্থির করিল, সে আর কার্ত্তিকপুর থাকিবে না, কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় যাইলে পয়সার অভাব কি? যাহারা মূর্খ, বোকা, গবাকান্ত, তাহারাই কলিকাতার মত যায়গায় গিয়াও কিছু করিতে পারে না। কলিকাতায় পয়সা বাতাসে উড়িতেছে, ধরিয়া লইতে পারিলেই হয়—এ কথা ধ্রুব সত্য, খালি ওটা মুখের কথাই নয়। সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরকে কহিল—"চল গৌর, কলকাতায় যাই। কি সুখে আর কার্ত্তিকপুরে থাক্‌বি?—যাবি?"

"যাব।"

দুই বন্ধুতে তখন অনেক কথা, অনেক আলোচনা, অনেক শলা-পরামর্শ হইল। কলিকাতা গিয়া দুই বন্ধুর যে পয়সা উপার্জ্জন হইবে, এবং তদ্দ্বারা যে সুখের হাওয়া তাহাদের ঘিরিয়া নিশিদিন প্রবাহিত হইবে, তাহারই স্বপ্নে দুই বন্ধু মস্‌গুল্ হইয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বেই কলিকাতা-যাত্রার একটি শুভদিন তাহারা স্থির করিল।

তাহাদের বিদায়ের পূর্ব্বে 'বিজলী ক্লাবে' একদিন 'ফীষ্টে'র ব্যবস্থা হইল। খিচুড়ী, ডিম ভাজা, বেগুন ভাজা, আলুর বড়া, আমড়ার চাটনী এবং ইত্যাদি।

'ফীষ্টে'র দিন বৈকাল হইতে আয়োজন হইতে লাগিল। ব্যাপার নেহাৎ

সামান্য নহে। প্রায় কুড়িজন মেম্বার। চাউল, দাল, ডিম, আলু, বেগুণ, মশলা, তৈল, ঘৃত, লবণ, কড়া, ডেক্‌চি, কলাপাতা, কাঠ—বহুদ্রব্যের আয়োজন। তারপর পান আছে, ধূমপান আছে এবং আরও কি কি আছে।

সন্ধ্যার কিছু পরে হীরালাল একটা বড় রকমের প্রস্তাব করিয়া ফেলিল, বলিল—"খিচুড়ীর সঙ্গে পাঁঠা হ'লে বেশ জুত হ'ত।" প্রস্তাবের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহা অনুমোদন হইয়া গেল। তখন সকলের মধ্যে একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বেই স্থির হইয়া গেল, গোপাল বাগ্দীর খামার বাড়ীতে গোয়ালের মধ্যে তার যে সাদা খাসীটা থাকে, তেলি-পুকুরের পাড় দিয়া গিয়া, সেটার মুখ বাঁধিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যথাসময়ে গোপাল বাগ্দীর সাদা খাসীটি এবং একখানি খাঁড়া আসিয়া পড়িল। যথাসময়ে খাসী বলি এবং রন্ধনও হইয়া গেল। নটবর কহিল—"আমি কিন্তু পাঁঠা-ফাঁঠার দিকে নেই। ও আমি খাচ্ছি না। আমি 'বলি'র 'এগেন্‌স্‌ট'-এ।"

শিবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল,—"এ বলিতে কোনো দোষ নেই। এ ত আর দেবতার কাছে 'বলি' নয়। এতে পাঁঠার যেমন প্রাণ ঠিক তেমনি থাক্‌বে, লাভে থেকে খুব ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে তার মাংসটা আমাদের খাওয়া হ'য়ে যাবে।"

সুরেন কহিল,—"নুটো ছেলেবেলায় ছাগলের দুধ খেয়ে মানুষ, সেই জন্যে ছাগ জাতের ওপর ভয়ানক দরদ। মুর্গী-বলি দাও, তাতে ওর বোধ হয় কোন অমত নেই।"

গৌর কহিল,—"তা নয়, তা নয়, কেষ্টগঞ্জের গোঁসাইবাড়ী ওর বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে; সেই জন্যে আগে থাক্‌তে ও রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছে।"

ছোট্ট একটি আগুনের ফুল্কী হইতে যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, বিন্দু-প্রমাণ একটি ছিদ্র দিয়া যেমন বৃহৎ তরণী জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায়, তেমনই এই সামান্য কথা উপলক্ষ করিয়া নটবরের সহিত আর সকলের তুমুল বচসা ও কলহ বাধিয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা আগে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহাই ঘটিয়া গেল। হুলুস্থুল কাণ্ড। কাণ্ডের চরম অবস্থায় শিবু নটবরকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে কহিল—"গেট্ আউট্ ইউ র‍্যাস্কেল্।" নটবর আদপেই ইংরেজি না জানাতে, সে সমান ওজনে তেজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া গোঁজভরে ক্লাব-ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

হীরালাল কহিল,—"ও বোধ হয় একটা কিছু কাণ্ড করবে।"

সুরেন কহিল,—"করবে—অশ্বডিম্ব।"

শিবু কহিল,—"গৌর, ওকে 'ফলো' ক'রে দেখ্‌তো, কোথায় যায়।"

গৌর লাফাইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি সকলকে যে সংবাদ দান করিল, তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। মিনিট দুই পরে শিবু কহিল—"আজই রাতে গোপাল বাগ্দীকে থানায় পাঠিয়ে—?"

প্রফুল্ল পরামর্শ দিল—"তা হ'লে দারগাকে সঙ্গে করে এনে একেবারে মালশুদ্ধ—এক কাজ করা যাক এস। তাড়াতাড়ি সকলে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে, হাড়-গোড় সব ফেলে দিয়ে একেবারে নি-ঝঞ্ঝাট—"

বাধা দিয়া শিবু কহিল—"থাম্। ওতে পার পাবি না। পাঁঠা মারা, রান্না, খাওয়া সব প্রমাণ হ'য়ে যাবে। এই যে, পাশে আমাদের মহা শত্তুর যদু মোড়লটি আছে, ও-ই সাক্ষী দেবে; আর মুটো তো আছেই। সুতরাং প্রমাণ হ'তে বাধ্ বে না।"

শিবুর কথায় সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়িল। শিবু কহিল—"দুতিন শিশি 'কোবরা-ব্ল্যাক' পাওয়া যাবে?"

দু-তিন জন বলিয়া উঠিল—"যাবে।"

"শীগগীর নিয়ে এস।—আর একটা বুরুস।"

যথাসময়ে "কোব্‌রা-ব্ল্যাক" আসিয়া পড়িল, বুরুস্ আসিল। তাহার পর সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইল, তাহার পর যে-যাহার বাটি চলিয়া গেল। এঁটো-পাতা, হাড়-গোড় সকলই স্ব স্ব স্থানে পড়িয়া রহিল।

শেষ রাত্রিতে গ্রামের তিনজন চৌকীদার, বিজলী ক্লাবের মেম্বারদের গৃহে হাঁটা-হাঁটি ও তাহাদের ডাকা-ডাকি আরম্ভ করিল,—থানা হইতে দারোগা আসিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে গোপাল বাগ্দীর খাসী চুরির 'কেশে'র এন্‌কোয়ারী হইবে।

সেই শেষ রাত্রিতেই ক্লাব-ঘরে দারোগার এন্‌কোয়ারী বসিল। সারি সারি এঁটোপাতা ও পাঁঠার হাড়-গোড় দেখিয়া দারোগা কহিল,—"দেখ্‌ছি, আপনাদের ভালো রকমই ভোজ হোয়েছে!"

শিবু কহিল,—"আজ্ঞে, তেমন বিশেষ কিছুই নয়; খিচুড়ী আর পাঁঠা মাত্র।"

বাহিরের বারান্দায় ফরিয়াদী গোপাল বাগ্দী ও নটবর, ও-পাড়ার নন্দ পাল্ এবং এ-পাড়ার যদু মোড়ল প্রসন্নমুখে বসিয়াছিল।

শিবু বলিল,—"মাঝে মাঝে একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদ করা যায় আর কি!"

"মন্দ নয়। গাঁয়ে খাসীর ত আর অভাব নেই;—অন্ধকারে মুখ বেঁধে টেনে আন্‌লেই হ'ল। তা, এবার বুঝি গোপাল বাগ্দীরই পালা পড়েছিল—তার সাদা খাসীটি?"

"বুঝতে পাচ্ছি না, কি বলছেন।"

"বল্‌ছি, গোপালের সাদা খাসীটিকেই এবার চুরি ক'রে ফীষ্ট করা হয়েছে?"

"গোপালের? সাদা খাসী?—বলতে পারি না। আমরা কাল হাট থেকে একটা কালো খাসী কিনে এনেছিলুম। সস্তায়—অর্থাৎ সিকে নয়েকের ভেতর পাওয়া গেল, তাই—"

"কাল খাসী? ছালখানা তার ফেলে দিয়েছেন নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে না, ছালখানা কি ফেলে দিতে পারি? ওটা যে পাঁচ ছ' আনাতে বিক্রী হ'বে, মশাই। ঐ যে দেয়ালের গায়ে ঝুলছে।"

দারোগা সেই দিকে তাকাইল। ফরিয়াদী গোপাল বাগ্দী ও তাহার পক্ষীয় সকলেও সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, সকলেই থতমত খাইয়া গেল।

অতঃপর 'এন্‌কোয়ারী' বেশী দূর গড়াইল না। দারোগা রিপোর্ট লিখিল—"কেশ মিথ্যা। সাদা খাসী নয়—কালো খাসী।" গোপাল বাগ্দীর উপর দারোগা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে গো-যানের ছইয়ের মধ্যে গিয়া উঠিয়া বসিল।

শিবু তখন সকলকে কহিল,—"কোবরা-ব্ল্যাক্ মাখিয়ে ছালখানা 'পেন্ট্' না ক'রে ফেললে,—অনেক ভোগই ভুগ্‌তে হ'ত।"

গৌর স্ফূর্ত্তিতে গান ধরিল :—

'তব চরণতলে হৃদয় আমার,
চায় বিকাতে মধুর রাতে—'

৩

কলিকাতার আহিরীটোলায় একটি বাটির সদর-দরজার সম্মুখে গিয়া একটি যুবক দাঁড়াইয়া গেল। অতঃপর বাড়ীটির দিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া, দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে, যুবক ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কি ৭৬নং? বামাচরণ মিত্র এখানে থাকেন?"

"হ্যাঁ, তিনি আমার মেসোমশাই হ'ন। ডেকে দেব? দিচ্ছি আপনি বৈঠকখানাতে বসুন।"

মিনিট পাঁচেক পরেই মেসোমশাই শ্রীযুক্ত বামাচরণ মিত্র আগন্তুকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি দরকার?"

"আপনার কিছু হারিয়েছে কি?"

"হারিয়েছে? হ্যাঁ, হারিয়েছে বৈ কি! আমার বুদ্ধি-শুদ্ধিই হারিয়েছে। একটি ছেলের অসুখ। তার চিকিৎসা নিয়ে আমায় যেন নাস্তা-নাবুদ ক'রে ফেলেছে। দুর্ভাবনা ভেবে ভেবে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধিই—"

"কোন জিনিষ আজ আপনার হারিয়েছে কি? কোন কাগজপত্র—কোন টিকিট্—কোন—?"

"একখানা ট্রামের মান্থলি টিকিট্ আজ হারিয়েছি মশায়! মাথার নেই ঠিক, হারাবার আর দোষ কি বলুন। পেয়েছেন আপনি? খুবই উপকার হ'ল। ধন্যবাদ আপনাকে! আপনি কোত্থেকে আস্ছেন? ট্রামভাড়াটা দিয়ে দি আপনাকে। অশেষ ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ।"

"ট্রামভাড়াটা আমি নিতে পারবো না। আর আপনার টিকিট কুড়িয়ে পেয়ে আপনাকে দিতে আসা, এটা আমি উপকার ব'লে মনে করি

না, এটা আমার কর্ত্তব্য; না ক'রলে পাপ। সুতরাং এর জন্য ধান্যবাদও আমি পেতে পারি না।"

অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়ের আলাপ-আলোচনার পর, উভয়ে উভয়কে নমস্কার জানাইল এবং নমস্কার জানাইবার পর, শিবু-মিত্র মহাশয়ের গৃহত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

শিবু উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছে। একলা আসে নাই। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত গৌরকে দোসররূপে আনিয়াছে। উভয়ে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা মেসে আছে। গৌর সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে আনিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাতেই মেসের খরচ-আদি চলিতেছে।

পথে বাহির হইয়া শিবু মনে মনে বলিল—"মাসকাবারের ত মোটে আর পাঁচটি দিন বাকী। টিকিট্খানা না দিয়ে যদি রাখতুম, না হয় পাঁচটা দিন ব্যবহার করতে পারতুম। তাতে আর এমন কি বিশেষ লাভ হ'ত? ধরা প'ড়লে কুড়িটাকা জরিমানার ভয়ও ছিল; তার চেয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে এ যা করলুম—খুবই ভাল হল। তান্ত্রিক জ্যোতিষী বলে আমার ওপর বুড়োর ত খুব বড় গোছের একটা ধারণা জন্মে দিয়ে গেলুম। এই ধারণার ফলে দেখি, কতদূর কি করতে পারি। জাল ত পেতে রেখে এলুম,—দেখা যাক্। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর আসতেই হ'বে একবার।"

মঙ্গলবার দুপুরবেলা আহারাদির পর সিগারেট টানিতে টানিতে শিবু গৌরকে কহিল—"গৌর!"

"বল।"

"ঠিকানাটা মনে আছে ত?"

"পরিপাটীরূপে। ১১৭, পার্ক য়্যাভিনিউ, বালীগঞ্জ।"

"ঐটে ওর জামাইয়ের বাড়ী। জামাই ব্যাঙ্কে চাকরী করে। ছ'টায় বাড়ী আসে, আর কোথাও বা'র হয় না। তুই ঠিক সওয়া সাতটায় সেখানে যাবি। এখানে আমিও বুড়োর কাছে ঠিক সাতটায় গিয়ে হাজির হব। বুঝলি ?"

"কাল থেকে বুঝছি, আর তোর বোঝাতে হবে না।

সাতটা বাজিতে মিনিট ৫।৭ বাকী থাকিতে, শিবু আহীরিটোলায় ৭৩নং বাড়ীর বৈটকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। মিত্র মহাশয় গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। শিবুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—"আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি। আপনার কথাটা আমি ভাল ক'রে ভেবে দেখলুম। গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-লগ্ন মিলিয়ে বিচার করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে যে অকাট্য ফল পাওয়া যায়, সে কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি। গ্রহ-শান্তির দ্বারাই আমার ছেলেটির খুব শীগ্‌গীর সেরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু আজকাল এইসব কাজে আর—"

"বিশ্বাস হয় না,—এই ত ? তা' না-হবারই কথা। সামান্য একটু-আধটু শিখে যে-রকম ব্যবসাদার জ্যোতিষীর হুড়ো-হুড়ি, আর সাইন-বোর্ডের ছড়া-ছড়ি, ত'াতে—স'াত-নকলে আসল ভে'স্তা হয়ে পড়েছে। সেই জন্যেই ত, মিত্তির মশাই,—ঠিক পেশা হিসাবে বিদ্যেটাকে লাগাইনি। জ্যোতিষীর জুচ্চুরীর কথা ত নতুন নয়, কথাটা পুরানো হয়ে গিয়েছে। 'বসুমতী'তে মাঝে মাঝে কত গল্পই না পড়ি।"

"সেই জন্যেই বলছি, জিনিষটা ভাল এবং কার্য্যকরী খুবই, কিন্তু—"।

"যাক, আপনার 'কিন্তু'র জের আমি রাখবো না। যদি আপনাকে এই দণ্ডেই বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারি ? আচ্ছা, আপনার এই ছেলেটি ছাড়া আর ছেলে আছে ত ? সে এখন বাড়ীর মধ্যে কি কচ্চে, আমি ব'লে দেব।"

'উই আর সেভেন্'

শ্রীযুক্ত বামাচরণ মিত্র মহাশয় হি হি করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন—"ছেলে আমার ঐ একটি, যেটির অসুখ। ছেলে একটি, মেয়েও একটি। সেটির বিয়ে হয়েছে। তারা বালীগঞ্জে থাকে।"

"আপনার জামাইটির নাম কি? তাঁর রাশিটা জানা আছে? আপনার মেয়েটির কি রাশ?"

"মেয়ের রাশি হচ্ছে বৃশ্চিক; তার নাম সুরবালা। জামাইটির নাম কেতকীমোহন, তার রাশিটা বোধ হয়—ধনু।"

"ধনু? তা হ'লে অগ্নি রাশ।"

ফাউনটেন-পেন বাহির করিয়া নোট-বইয়ের সাদাপাতায় মিনিট পাঁচ-ছয় ধরিয়া কি সব আঁক-টাঁক কাটিয়া, লিখিয়া, শিবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, এবং তাহার পর মাথা তুলিয়া কহিল—"দেখুন, খাঁটি হিসাবের ফল কতখানি সত্য হয়! ঠিক এই সময় আপনার জামাই কোন-একটি লোকের কাছ থেকে কিছু কিনছেন।"

"কি কিনছেন?"

"সেটা সঠিক ভাবে এ অবস্থায় বলতে পারা যাবে না। তবে, কোন বই-টই বা কালি-কলম, পেনসিল-টেনসিল, বা লেখাপড়ার সম্পর্কে আর কিছু। কাল সকালে একটা লোক পাঠিয়ে আমার কথাটা একবার পরীক্ষা করে দেখবেন ত। আমি না হয় আবার কাল এমনি সময় আসব।"

উৎসাহিত হইয়া মিত্র মহাশয় কহিলেন—"কাল কেন? আমারও ফোন্ আছে, তাদেরও আছে, এখনই—জানলেই হয়।"

মিত্র মশাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া রিসিভারটা হাতে লইলেন।

"সাউথ্ থ্রি ফাইভ্ জিরো নাইন্—কে কেতকী?"

"হ্যা।"

"আমি আহীরিটোলা থেকে বলছি। তুমি এখন কি করছ?"

"আজকের খরচের হিসেবটা লিখছি।"

"কতক্ষণ থেকে হিসেব লিখছ?"

"এই সবে লিখতে বসেছিলুম। খান কতক বাঙ্গলা বই কিনলুম, এখন, সেই খরচাটা লিখছিলুম।"

"কি বই?"

বাঙ্গলা গল্পের বই। একটি ছোকরা বেচতে এসেছিল। খান আষ্টেক বেছে বেছে রাখলুম,—'স্বর্ণলতা', '৭০৩', 'যুগ-ধর্ম্ম', 'শ্রীগৌরাঙ্গ,' এই সব।"

পরম বিস্ময়ে মিত্র মশায় রিসিভার রাখিয়া শিবুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। অতঃপর আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর শিবু কহিল—"কুপিত গ্রহকে শান্ত করতে, বড় জোর গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে। আমায় আর আপনাকে কিছু দিতে হবে না; কেন না, আমার ত এটা ঠিক ব্যবসা নয়। বিদ্যাটা শিখেছি, যদি এর দ্বারা পরোপকার হয়, সেইটেই ত মহালাভ; জন্মান্তরের মূলধন। তবে একথা জোর ক'রে বলতে পারি, গ্রহ শান্ত হলেই আপনার ছেলেটি ভাল হয়ে যাবে।"

"পঞ্চাশ টাকা এখনই তা হ'লে দিতে হবে ত?"

"আজ্ঞে। আর ছেলেটির হাতের একটা মাদুলী কি একটা আংটী, যা সে নিত্য ব্যবহার করে। সুবর্ণের হওয়া চাই। একটা 'অন্তর্ধাবন-শুদ্ধি' ক'রে দিয়ে, তৃতীয় দিনে ফেরৎ দিয়ে যাব, সেই দিন থেকে আবার ব্যবহার করতে হবে।"

"অন্তর্ধাবন-শুদ্ধিটা কি ব্যাপার?"

"সে আপনি বুঝবেন না। তন্ত্রোক্ত একটা বিশেষ ক্রিয়া।"

আরও দুই চারিটা কথা, দুই চারিটা উপদেশ, দুই চারিটা প্রশ্ন, দুই চারিটা উত্তরের পর, দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি সোনার আংটি লইয়া শিবু মিত্র-মশায়ের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর চলিয়া গেল।

৪

"গৌর।"

"হুজুর।"

"হ্যাঁরে, ও বইখানা বুঝি নিলে না?"

"কোন্ বইখানা?"

"ঐ যে 'চুম্বন—তাহার শক্তি ও প্রয়োগবিধি।"

জামাইটা সেকেলে গোছের বোধহয়, নইলে ঐখানাই ত আগে নেবার কথা। বইখানা এদেশে যিনি ছাপিয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। যাক্—চল্ দিকি ঐ মোড়ের পোদ্দারের দোকানে গিয়ে আংটীটির সদ্গতি ক'রে আসা যাক।"

"সদ্গতি ক'রে আসা যাক?"

"হ্যাঁ।"

"চ, যাই। কিন্তু এরকম ক'রে তোর পয়সা উপার্জ্জন কতদিন চলবে, তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"কি করা যায় বল্। চাকরীর বাজার ত দেখ্‌ছিস্। এ রকম ক'রে খরচটা চালান চাই ত।"

"শোন শিবু, আমার বুদ্ধি নে। দু'জনে খেটে-খুটে, আয়—কোন একটা ছোট-খাটো ব্যবসা করা যাক।"

মোড়ের দোকানখানি সকালবেলা খুলিয়া পোদ্দার মহাশয় ভিতরে বসিয়া বোধ হয় মনে-মনে নাম জপ করিতেছিলেন। রেলিং দিয়ে ঘেরা ভিতরের খানিকটা স্থানে তাঁহার কারিকর উনানে হাপরের বাতাস করিতে করিতে গুন্ গুন্ করিয়া কৃষ্ণনামের এক কলি গান গাহিতেছিল। শিবু গৌরকে সঙ্গে করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল এবং গতকল্য আহীরিটোলার মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত 'অন্তর্ধাবন-শুদ্ধি' করিবার সেই সোনার আংটীটি পোদ্দার মহাশয়ের হস্তে দিয়া কহিল,—"এটি বিক্রী করব।"

কিছুক্ষণের জন্য নাম-জপ স্থগিত রাখিয়া, পোদ্দার মহাশয় ভাল করিয়া আংটীটি দেখিতে লাগিলেন। শিবু ও গৌর তাঁহার সম্মুখের দুইখানি চৌকীতে আসন গ্রহণ করিয়া বসিল। পোদ্দার মহাশয় কহিলেন,—"বড্ড পান্; না গালালে বোঝা যাবে না।" বলিয়া ভিতরের রেলিং-এর ফাঁক দিয়া আংটীটি তিনি কারিকর কালিপদর হাতে দিলেন, কহিলেন,—"গালিয়ে ফেল।" কৃষ্ণনামের গানের কলিটি বন্ধ করিয়া কালিপদ আংটীটি হাতে করিয়া লইল এবং তাহা একটি মুচির ভিতরে স্থাপন করিয়া জোরে জোরে হাপর করিতে লাগিল। প্রবল অগ্নিতাপে আংটীর সোনা গলিয়া গেল, কিন্তু ভক্ত কালিপদর হৃদয়ের জমাট হরি-ভক্তি সে তাপে বিন্দুমাত্র গলিল না, আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। সে হাই তুলিতে তুলিতে বলিয়া উঠিল,—'হরি—হরি—হরি!"

হাইয়ের সধর্ম্ম—একজনের উঠিলেই আর এক জনের উঠে। অবশ্য দু'য়ের প্রাণ-মন এক সুরে বাঁধা থাকা চাই,—অর্থাৎ 'বেতার' আবিষ্কারের

মূল সূত্র। সুতরাং কালিপদর হাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—'হর-হর-হর' বলিয়া পোদ্দার মশায়ও প্রকাণ্ড এক হাই তুলিয়া ভাল করিয়া নড়িয়া বসিলেন। শিবু চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"খবরদার, ওসব চালাকী চলবে না পোদ্দার মশাই, দোকানে তা হ'লে রাত্রিতে আগুন লাগিয়ে দেব; আমরা বিজলী ক্লাবের মেম্বার।"

গৌর একেবারে চমকিত—অবাক্।

পোদ্দার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"কি হ'ল আপনার—ব্যাপার ক?"

"আমরা বিজলী ক্লাবের মেম্বার,—ব্যাপার বুঝতে কি আর আমাদের আটকায়? উনি ওখান থেকে মত জিজ্ঞাসা করলেন,—'হরি-হরি-হরি'? আপনি বল্লেন,—'হর-হর-হর'। আরে সাড়ে সাত আনা ত সোনা। ওর থেকে ত হর্‌লে চলবে না। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রম ক'রে, ঐটেই ত 'অন্তর্ধাবন' দ্বারা 'হরা' হয়েছে; ও ।৶১০ আনার গিনির নেহ্য দাম দিতে হবে: গণ্ডা-আষ্টেক পয়সা না হয় লাভ রাখবেন।"

অতঃপর উভয়পক্ষে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হইয়া, একটা সন্ধি হইল এবং পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করিবার পর, শিবু, পোদ্দার-প্রদত্ত বিড়িটি ধরাইয়া, আংটীর দাম ১৩।৶১৫ পকেটে ফেলিয়া, গৌরের হাত ধরিয়া দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তখন বেলা দশটা, সওয়া দশটা। ছেলে-মেয়েরা সব স্কুল-কলেজে যাইতেছিল। শিবু গৌরকে গা-ঠেলা দিয়া ইসারায় ও-দিককার ফুটপাথের দিকে দেখাইল। সেইদিক দিয়া তখন একটি তরুণীর দল, বুকে বই চাপিয়া কলেজে যাইতেছিল। তাহাদের কাহারও পায়ে স্যাণ্ডেল, কাহার পায়ে ভেলভেটের জরিদার নাগরা, কাহারও বা পায়ে হাই-হিলযুক্ত ফার-ফোর

শ্লিপার। কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশের তরুণীদের বিক্রয়ের জন্ত বোম্বাই, আমেদাবাদে যে দামী সাড়ী প্রস্তুত হয়, পরণে সকলেরই সেই সাড়া এবং তাহা পরিবার কায়দা—যেমন হইয়া থাকে তেমনই। চুল—সকলেরই সুন্দর, শোভন, নামমাত্র তৈলযুক্ত এবং এলো-খোপায় বন্দী।—দু' একজনের চক্ষুতে চশমা। তাহাতে তাহাদের মুখের কি চশমার সৌন্দর্য্য বাড়িতেছে, তাহা না ভাবিয়া বলা যায় না। চলন—সকলেরই ধীব-মন্থর গতিযুক্ত, মুখভাব—চাপা আনন্দ মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যময়।

সেইদিকে দেখিতে দেখিতে শিবু ও গৌর মেসের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

৫

ছয় মাস হইল শিবু ও গৌর কলিকাতায় আসিয়াছে। কিছুদিন হইল মির্জ্জাপুরের মেস ছাড়িয়া বর্ত্তমানে ভবানীপুরের একটি মেসে তাহাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেখানে দু'তিন মাসের টাকা বাকী পড়িয়া যায়। তাগাদার পর তাগাদা করিয়াও যখন তাহা আদায় হয় না, তখন একদিন খুব ঝগড়া-ঝাটি ও গালাগালি করিয়া মেসের কর্ত্তা তাহার বাকী পাওনা আদায় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তবুও সব টাকাটা আদায় হয় নাই। কিছু ছিটে বাকী ছিল।

সেইজন্ত উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়া উভয়ে এখন একেবারে দক্ষিণ প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নূতন মেসে আসিয়া, আদি এবং অকৃত্রিম নাম দুইটাকে তাহাদের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। গৌর

হইয়াছে নিতাই। তবু সে একরকম গোষ্ঠীর মধ্যেই আছে, কিন্তু শিবুকে একেবারে কৈলাস ত্যাগ করিয়া আকাশে উদয় হইতে হইয়াছে। সে শশধর হইয়াছে।

শিবু চাকরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। কলিকাতার দক্ষিণে গড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি কাজ খালি আছে। কয়দিন ধরিয়া সেই কাজটির জন্য খুব ঘোরা-ঘুরি করিতেছে। কোন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন কমিশনারকে ধরিতে পারিলেই তাহার কাজটি হইয়া যায়। সন্ধান লইয়া সে জানিল, কয়েকজন কমিশনার আছেন, তাঁহারা একেবারে নিরীহ প্রকৃতির, তাঁহারা সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। তাঁহারা কাহারও জন্য বড়-একটা সুপারিশও করেন না। তাঁহাদের বিশেষ কোন প্রতিপত্তিও নাই। আর কয়েকজন আছেন, তাঁহাদের প্রতিপত্তিও যত, তেমনই সর্ব্বকার্য্যের মধ্যেই তাঁহারা ঢুকিয়া আছেন। কিন্তু দুষ্ট লোকদের দ্বারা বাজারে তাঁহাদের দুর্ণামও যথেষ্ট। তাঁহাদের দ্বারা সহজে কোন সুযোগ আদায় করা অত্যন্ত সুকঠিন। ইঁহাদের মধ্যে শুধু রূপচাঁদ বাবুর অবস্থা ভিন্নরূপ। তাঁহার প্রতিপত্তিও যেমন, সর্ব্বসাধারণের নিকট সুনামও তেমনই। অতি খাঁটি লোক তিনি। নারায়ণ পূজা না করিয়া তিনি কোন দিন জলগ্রহণ করেন না। মোটরে উঠিয়া অন্য সকলে যখন খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করেন, তিনি সে সময় পকেট হইতে 'বরফি'-গীতা বাহির করিয়া তাহার কোন একটি অধ্যায় অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যও যথেষ্ট। সবচেয়ে প্রশংসনীয়—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এবং বিপত্নীক হইয়াও চরিত্রবলে তিনি মহাবলী। তিনি রাজর্ষিতুল্য। রূপচাঁদ বাবুকে ধরিতে

পারিলেই শিবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কিন্তু আজ তিন চারদিন চেষ্টা করিয়াও সে তাঁহার দেখা পাইতেছে না। সর্ব্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত। ঘরে বা বাহিরে তিনি খুব কম সময়ই থাকেন। একজন লোক চুপি চুপি শিবুকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁকে ধরতে হ'লে ৫৩।১ হাড়কাটা গলি, 'পুতুল-চারু'র ওখানে না গেলে আর হবে না।

আজ সকালে শিবু সেইখানে গিয়াছিল। অনেক যোগাড়-পত্র এবং ফিকির-ফন্দীর পর চারুবালার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল। চারু পুতুলই বটে। রূপ তাহার ফাটিয়া পড়িতেছিল। এমন রূপ না হ'লে কি আর রূপচাঁদ ভোলে। যাই হোক, সেখানেও কিন্তু শিবু—রূপচাঁদ বাবুর দেখা পাইল না। সে চাকুরীটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানাইয়া, চারুকেই ধরিয়া বসিল। চারু কহিল—"আপনি কাজের আশা ছেড়ে দিন। আগে আমার কথা ঠেলতে পারতো না, যা ধরেছি তাই শুনেছে। একজন নতুন, ওকালতী পাশ ক'রে এসে একটা কাজের জন্যে আমাকে ধ'রে বসলো। ওঁকে বলতেই আড়াইশো টাকা মাইনেতে 'স্যানিটারি' অফিসারের কাজে তাকে বসিয়ে দিলে।"

"ল পাশ ক'রে হ'ল—স্যানাটারি অফিসার?"

"হ'ল বৈকি! আমার সুপারিশে।"

"সন্ধ্যাবেলা এলে কি তাঁর দেখা পাব এখানে?"

"না। আগে সর্ব্বদাই প্রায় এখানে থাকতেন বটে, কিন্তু আজকাল—। আপনি 'মহিলালয়' জানেন; ঐ যে নতুন খুলেছে?"

"না। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে কি?"

"আরে না না, জামা কাপড়ের আলয় নয়। ঐ যে লেক্ রোডে 'বসনালয়' নতুন খুলেছে, যেখানে জামা কাপড় খুব পছন্দ-সই আর

সস্তা, সেইটে ছাড়িয়ে খানিকটা পূবে গেলেই ঐ 'মহিলালয়'—অর্থাৎ মহিলাদের আলয়। এই সব অনাথা, বিধবা, সধবা মেয়েদের জন্য। আপনি আজকাল সেইখানে এঁকে পাবেন। সেইখানেই আজকাল খুব চলেছেন। কি আর বলবো মশাই, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হ'ল আমার; জীবনে 'বাবু'ও আমি দেখেছি অসংখ্য কিন্তু এরকম কু-চরিত্রের লোক—"

"আর দেখেন নি! তাই ত! আপনার মত লোকের সংসর্গে এসেও তাঁর এসব দোষ গেল না? বাস্তবিকই দুঃখের কথা বটে।"

আরও দু' একটি কথার পর শিবু হতাশমনে পুতুল চারুর ওখান হইতে চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে সে ভাবিল, একবার এই সকাল বেলাটাতেই লেক রোডে যাওয়া যাউক, যদি কোন রকমে রূপচাঁদ বাবুর সঙ্গে দেখাটা হইয়া যায়। সে ট্রামে উঠিয়া বরাবর লেকরোডে আসিয়া পড়িল। একটু খুঁজিতেই, একটি বাটীর ফটকের মাথার উপর সে সাইন-বোর্ড দেখিতে পাইল—'মহিলালয় (অনাথা দুস্থ মহিলাদের আশ্রম)।'

বহু চেষ্টার পর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। রূপচাঁদ বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

রূপচাঁদ বাবু তাহাকে কহিলেন,—"গড়িয়া মিউনিসিপ্যালটীর কাজ সম্বন্ধে আমার কোন হাতই নেই। একেবারেই অসম্ভব।"

শিবু হতাশ হইয়া কহিল,—"যদি কোন রকমে কাজটি আমায়—"

"উপায় নেই—উপায় নেই। যাও তা হ'লে, আমি একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি।"

"আজ্ঞে আর একটু কথা আছে।"

"আবার কি কথা? শীগ্গীর ক'রে সেরে ফেল।"

"দেখুন, আমার দুইটি বিধবা আত্মীয়া আছেন। যৎপরোনাস্তি দুরবস্থায় তাঁরা পড়েছেন, আপনাদের এখানে তাঁরা যদি একটু—"

"তাঁদের কি ছেলেপুলে নেই? কি ক'রে এখন চলে?"

"চলে না। যেটুকু চলে, তা পাঁচ জনের দয়ায় আর তাদের নিজেদের চোখের জলে। একটি অবিশ্যি বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশীদিন বোধ হয় তাঁকে কষ্ট আর পেতে হবে না; কিন্তু—"

"আর একটির বয়স কত?"

"একেবারে ছেলেমানুষ, বছর একুশ বাইশ হবে। সমস্ত দুঃখের জীবনটাই এখন তার প'ড়ে রয়েছে। আপনাদের এই মহৎ এবং সৎ আশ্রয়ে স্থান পেয়ে যদি প্রাণটাকে আর চরিত্রটাকে বজায়—আপনার হাতে কি বই ওখানা?—ওই অত ছোট?"

"হ্যাঁ; নরফী-গীতা।"

"সকালবেলা অনাথাদের পড়ে শোনাতে হয় বোধ হয়? যাক—তা'হলে যদি আপনার হুকুম পাই—তা'হলে আমার আত্মীয়া দু'টিকে—

"দেখ, দুজনকে একেবারে ত য়্যাড্‌মিট্ করতে পারা যাবে না, কেন না আরও ত সব আছে। ঐ ছোট মেয়েটিকে না হয় নিয়ে এস। কবে আনবে?"

"আজ্ঞে তা'হোলে—দিন আষ্টেক—"

"না না; কালকেই নিয়ে এস, নইলে হয় ত সীট পাওয়া যাবে না। চা খাও তুমি? হ্যাঁ, আর মিউনিসিপ্যাল অফিসের কাজটার জন্যেও নিয়ে এস একখানি দরখাস্ত লিখে,—দেখা যাবে এখন। তা হ'লে যেন দেরী ক'রে ফেল না, কালই ঠিক এসো। বুঝেছ? অনাথা আর য়্যাপ্লিকেশন দুই-ই কাল সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

রূপচাঁদ বাবু শিবুর জন্ম চা আনিতে হুকুম করিলেন।

আরও ২।১টি কথার পর শিবু চা-পানান্তে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মেসে আসিয়া এই সব গল্প বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ গৌরকে শুনাইতেছিল।

চুপ করিয়া সমস্তক্ষণ শুনিবার পর হঠাৎ গৌর হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। হাসি থামিলে সে কহিল,—"রগড় হচ্ছে মন্দ নয়!"

"মাইরি, ভাল লাগছে না কিছু আমার। একটা কাজ-কাজ না হ'লে আর—"

"সেই গুজরাটিটার আফিসে একটু ভাল ক'রে চেষ্টা করে দেখ্‌না।"

"আজই যাব সেখানে। সেখানেও যাব একবার, আর 'বেহার ট্রেডিং কর্পোরেসনে'ও একবার যাব।"

দ্বিপ্রহরে শিবু গুজরাটিটার অফিসে গিয়া হাজির হইল। সেখানে তিন চারিটি লোক লওয়া হইবে। প্রত্যূষে শিবু যখন 'লেকে' বেড়াইতে আসে, এই গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ও হয়। লোকটি খুবই ভদ্র এবং অমায়িক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখান হইতে নিরাশ হইয়া শিবুকে ফিরিতে হইল। তিনি কহিলেন—"শশধর বাবু, আমাদের একটা নিয়ম আছে। সাধ্যমত আমাদের দেশের লোক ছাড়া আর কাকেও য়্যাপয়েণ্ট করবো না। সুতরাং বড়ই দুঃখিত হলাম—নমস্কার।"

রাগে এবং দুঃখে শিবুর অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে তখন 'বেহার ট্রেডিং কর্পোরেসনে'র আফিসে যাইবার উদ্দেশ্যে একখানি বাসে উঠিয়া বসিল। তাহার হাতে এই বৎসরের একখানি 'শারদীয়া বসুমতী' ছিল। সেইখানি সে খুলিয়া, যে পৃষ্ঠাতে একখানি কার্টুন ছবির নীচে লেখা ছিল—

'ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই—ভাঙ্গা এ তরি,
তোমারই নানান দানে গিয়াছে ভরি।'

সেই পৃষ্ঠাটি মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল।

৬

সন্ধ্যার সময় শ্রান্তদেহে, বিষণ্ণ-মুখে, শিবু মেসে ফিরিয়া আসিয়া গৌরকে কহিল—"দেখ, এবার মরিয়া হয়ে কাজ করব। হয় এস্পার, নয় ওস্পার। টাকা—সত্যিই কলকাতায় উড়ছে, এবং যথেষ্টই উড়ছে—ধ'রে নিতেই হবে। সোজা পথে হাঁটলে পথের শেষ মিলবে না," বলিয়া সে তাহার আজিকার নিষ্ফলতার ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

গৌর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বেহার ট্রেডিংয়ের রঘুপতি প্রসাদও ঐ বলে ভাগালে?"

"হ্যাঁ। ও সব বোঝা গেছে। বাঙ্গালী যেমন বোকা! এখন দেখছি, এই বাঙ্গালী জাতটাকেই ঠকিয়ে না নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ঠকাবার পক্ষে এরা একেবারে ওয়ার্ল্ড-রেকর্ড ব্রেক করেছে! নিজেদের এরা যত বেশী চালাক মনে করে, তত বেশী এরা বোকা। এই ছবিখানা কাল বাঁধিয়ে এনে রাখিস ত, ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখব" বলিয়া শিবু সেই 'ঠাঁই নাই —ঠাঁই নাই'-এর ছবিখানা গৌরের হাতে দিল।

গৌর খানিক মৌন থাকিয়া কহিল—"দেখ, রাণাঘাটের সেজবাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আয় না, যদি কাজ-টাজের বিষয়ে কিছু সাহায্য

করেন। তোকে ত তিনি খুবই ভালবাসেন। আর সেই যে একটি খুব বড়লোক ডাক্তার বাবু—"

"পাগল হয়েছিস? রাণাঘাটের সেজবাবুর কথা আলাদা, কিন্তু সেই বড়লোক ডাক্তারের কথা বলছিস?—বড়লোক কখনও গরীবকে ভালবাসতে পারে না। দু একবার আমার গান-টান শুনে একটুখানি মোহ তাঁর জন্মেছিল; তাই দিন কতক—আমি যদিও ঠিক শিবনাথ ঘোষই আছি এবং গানও আমার গলা দিয়ে সেই রকম ভালই বেরোয়, কিন্তু মোহ ত আর লোকের চিরকাল থাকে না, অল্পদিন পরেই কেটে যায়! সুতরাং—বুঝলি না?"

"বুঝেছি।"

"ছাই বুঝেছিস্। আমার মত পাকা হ, তবে সব বুঝবি। জুচ্চুরীটা আমাকে ধরতে হয়েছে বটে, কিন্তু কি করি বল্ না? আমাদের দেশে যাদের পয়সা-কড়ি আছে, তাদের দ্বারা দেশের ভাল লোকের উপকার হবে না। আমি আমার কথা বলছি না,—এমন লোক আছে, যারা অতি পবিত্র, অতি ভদ্র, অতি সৎ,—কিন্তু ভগবান তাঁদের দৈন্যও দিয়েছেন—অতি। তাদের এমন স্বভাব যে, সহস্র দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন হলেও কারও কাছে গিয়ে মুখ ফুটে ব'লে হাত পাত্‌তে পারে না। বড় জোর, হয় ত একটু ইসারা—ইঙ্গিতে জানায় মাত্র। কিন্তু—"

বাধা দিয়া গৌর বলিল—"সমস্তদিন ঘুরে তোর মাথা খারাপ হয়েছে, শিবু। হাজারকরা ত নশো নিরেনব্বই জন লোক গরীব, একজনের হয় ত কিছু পয়সা-কড়ি আছে। গরীবদের বাঁচাতে হ'লে, তা হ'লে ত······বলিয়া হি হি করিয়া গৌর হাসিয়া উঠিল।

"তুই থাম্ থাম্। এর ভেতর বোঝবার তোর ঢের দেরী। ষ্টোভ্ ধরা, একটু চা তৈরী কর্।"

চা হইলে পর, কিছু জলযোগান্তে চা পান করিয়া শিবুর শ্রান্তি দূর হইল; একটি সিগারেট ধরাইয়া সে কহিল,—"বরাতে আমার অনেক কষ্টভোগ আছে। জীবনে যে খুব বেশী অন্যায় করেছি—তা করিনি; কিন্তু যে অন্যায়টা করেছি সেইটেই যে প্রকাণ্ড অন্যায়।"

"যথা?"

"যথা—বুড়ো বাপের প্রতি অসদ্ব্যবহার। মাসে বারোটি ক'রে টাকা তাঁর পুঁজি। কত কষ্টে আমাদের সব মানুষ-মুনুষ করেছেন। আর আমি উপায়ক্ষম হয়েও, তাঁর সেই কষ্টের অন্ন ধ্বংস ক'রে, মাসে বাবুগিরীতে তিরিশটা ক'রে টাকা খরচ করেছি। কতবার আমায় বলেছেন, বুঝিয়েছেন—আমি কাণ দিই নি। একটা পয়সার জন্মে বাবা এক এক দিন তামাক না খেয়ে থাকতেন, আর আমি রোজ দু বাক্স অর্থাৎ সাত আনার সিগারেট পুড়িয়েছি।"

"কিরে! আজ তোর ব্যাপার কি বল্ দেখি? হঠাৎ—"

"বাস্তবিক, আজ মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। চ'—একটু বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে আসি।"

রাত্রিতে আহারাদির পর শুইয়া শিবু কহিল—"গৌর, ঘুমুলি না কি?"

"না।"

"দেখ্, পরশু থেকে আমি হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করব।"

"কি করবি?"

"হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক—অনশন। মাইরি করবো। বলছি সব। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা ব'লে নি। পৌষ মাসে একবার রাণাঘাটে যাব। সেজবাবু যথার্থই আমাকে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু এ কথাও ভাবি যে, তিনি আমার কি করতে পারেন।"

"কেন ?"

"কেন এই জন্য যে, যাঁরা সম্পত্তিশালী, তাঁদের সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের পেছনেই তাঁদের সমস্ত সময়, শক্তি, আর ভাবনা খাটাতে হয়। গরীবের দিকে দেখবেন কি, তাঁরা তাঁদের নিজের সংসারটাও ভাল ক'রে দেখতে অবসর পান না, এ কথা আমি জানি। তার ওপর আরও একটা কথা জানি, সেটা হচ্ছে এই যে, আমি যে কারও কাছ থেকে উপকার পাবো, সেটাও ত আমার নিজের ভাগ্যে থাকা চাই। বাবার কথাটাই ভাবি। আপনার লোকে কে বাবাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ? রেখেছে ত পরেই। বুঝতে হবে, সেইটেই বিধির বিধান—ভাগ্যের লেখন।"

"ও সব তত্ত্বকথা এখন রাখ্। হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক কি বলছিলি ?"

"হ্যাঁ, পরশু থেকে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করবো। চাকরী-বাকরী করবোও না, পাবও না। আমি বলে নয়, কেউ-ই আর পাবে না। তুই আমাদের শশে কামারের ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর দেখেছিস্ ?"

"দেখেছি। সে ত ফাষ্টক্লাস জিনিস, আমার বোধ হয়, অনেক বিলিতির চেয়েও ভাল।"

"সত্যিই তাই। ওর ক্ষুরগুলো দু'টাকা ডজন দরে কা'রা কিনে নিয়ে যায়। শিংয়ের বাঁট আর নাম খোদাই হ'লে ন' সিকে। খাপ-টাপ করতে আর ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং করতে, সব শুদ্ধ বড় জোর তিন টাকা ডজন পড়বে। কলকাতার বাজারে ঐ ক্ষুর অন্ততঃ আট টাকা ডজন বিকোবে।"

"তা হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকে মরবি, না শশে কামারের ক্ষুর গলায় দিয়ে মরবি, সেইটে বুঝি ঠিক করতে পাচ্ছিস্ না ?"

"ঠিক করেছি। মরবো না—বাঁচবো। প্রথম হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকে বাঁচবো, তার পর শশের ক্ষুরে বাঁচবো।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, শেষবার আর একদফা জুচ্চুরী করতে হবে। নইলে উপায় নেই। প্রথমে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকের মারফত কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। তার পর, তাই দিয়ে এখানে ঐ 'কাট্‌লারি'র এক বিজনেস্ খুলবো। আমি এর সুড়ুক-সন্ধান সব সংগ্রহ করেছি। আমার খুব বিশ্বাস, সুপথে থেকে, খেটে খুটে এই ব্যবসাটা চালাতে পারলে আমাদের দু'জনেরই বোধ হয় অর্থকষ্ট আর থাকবে না। আর তাহ'লে, বাবার ওপর আমার এতদিনের অন্যায় করার পর, তাঁকে আমি সুখী ক'রে তাঁর আশীর্ব্বাদ পেতে পারবো।"

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শয্যায় শুইয়া দুই বন্ধু এ সম্বন্ধে বহু আলাপ আলোচনার পর উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িল।

৭

পরের সপ্তাহে লোকের মুখে-মুখে এবং কাগজে-কাগজে এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রচারিত এবং আলোচিত হইতে লাগিল। ভবানীপুরের এক 'মেস্'-এ শশধর নামক জনৈক যুবক একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এক মাসের মধ্যে এক সহস্র টাকা না পাইলে, অনশনে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। অনশনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি এই বলিয়া আহার এবং বাক্য বন্ধ করিয়াছেন যে, হিন্দুর দেশে শিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের একটা করিয়া টাকা দেওয়া আশ্চর্য্য ও অসম্ভব নহে। বাঙ্গলার এক হাজার লোকের নিকট হইতে এই মহৎ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে যদি এক হাজার টাকা সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনশনে মৃত্যুর জন্য সমস্ত পাপ এবং দায়—সমস্ত বাঙ্গালী জাতির।

এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার পর হইতেই অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অনশনকারীর নিকট লোক এবং অর্থ আসিতে আরম্ভ হইল। অনশনকারী কাহারও সহিতই কোন কথা বলেন না। তিনি গলাপর্য্যন্ত একখানি চাদরে দেহ আবৃত করিয়া এক ধারে শয্যায় শুইয়া থাকেন। তাঁহার অনুচর নিতাইকৃষ্ণ যথাসাধ্য সমাগত সকলের সহিত আলাপ আলোচনা করেন ও টাকা গ্রহণ করেন।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন গভীর রাত্রিতে, সেরখানেক খাবার ও বড় একবাটি দুধ খাইয়া শিবু গৌরকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ পর্য্যন্ত কত হ'ল ?"

"৫৭১৭"

"আর ২।১ দিনের মধ্যে দশ হাজারেই দাঁড়িয়ে যাবে দেখছি। হাজার খানেকেরই আশা করেছিলুম, কিন্তু দয়াময় দশ গুণ পাইয়ে দিলেন।"

ঠিকই তাই। দিন দুই তিনের পরে, ধর্ম্মময় বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মপূর্ণ কলিকাতা সহরে, ধার্ম্মিক বাঙ্গালীর দ্বারা, ধর্ম্মার্থ শিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, ধার্ম্মিকপ্রবর শিবনাথের হাতে দশ সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা আসিয়া জমা হইল, যাহার ফলে, বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড এক ঘর ভাড়া লওয়া হইল এবং ঘরের দেওয়াল-গাত্রে তদুপযোগী সুবৃহৎ এক সাইন-বোর্ড ঝুলিল, যাহাতে লেখা :—

শিবালয়

সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী ক্ষুর, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কারক।

প্রোপ্রাইটার্স—শিবনাথ ঘোষ ও গৌরকৃষ্ণ মণ্ডল।

'শিবালয়ে' উত্তরোত্তর অসংখ্য ক্রেতার ভীড় প্রত্যহ জমিতে লাগিল।

শেষ